বাংলার ব্রত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নেই যার সাহায্যে অনায়াসে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। যুগশিক্ষার সঙ্গে সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হলে চলবে না সেই কথা স্মরণ রেখে বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব-গ্রহণে ব্রতী হয়েছেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার ব্রত

আমাদের দেশে দু-রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলেছে যোষিৎপ্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত। এই মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাগ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারী ব্রত—পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী ব্রত—বড়ো মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। এই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত যেগুলি হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদেশে প্রচার লাভ করেছে, এবং দুই থাকে বিভক্ত এই মেয়েলি ব্রত যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধ হয় এবং যার মধ্যে হিন্দু-পূর্ব এবং হিন্দু এই দুই ধর্মের একটা আদানপ্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি, এই দুইপ্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী ব্রত এবং কুমারী ব্রত—ব্রতকে এই তিন ভাগে রেখে প্রত্যেকটির গঠন কেমন দেখা যাক। কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।

শাস্ত্রীয় ব্রত

প্রথমে সামান্যকাণ্ড—যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘট-স্থাপন, পঞ্চগোব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা-ন্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপন। এর পরে ভুজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা দিয়ে কথা-শ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা। সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।

নারী ব্রত

শাস্ত্রীয় ব্রতের অনেকখানি এবং খাঁটি মেয়েলি ব্রতেরও কতকটা মিলিয়ে এগুলি। এগুলি শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় দুই অনুষ্ঠানের যুগলমূর্তি বলা যেতে পারে। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা অনেকখানি চলে গিয়ে এবং

লৌকিক ব্রতের সরলতাও প্রায় নষ্ট হয়ে পূজারি ব্রাহ্মণ এবং সামান্যকাণ্ডের জটিল অনুষ্ঠান ন্যাসমুদ্রা তন্ত্রমন্ত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

কুমারী ব্রত

এই ব্রতগুলিই অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের গঠন এইরূপ—আহরণ, যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচরণ, যেমন কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পুজারি এবং তন্ত্রমন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই।

বেশ বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রতমালাবিধান চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইন পিল। লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের ছাঁচ দিয়ে রচনা করা হয়েছে। খাঁটি পুরাণগুলির ইতিহাস হিসাবে একটা দাম আছে। কিন্তু, এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোকসাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়। ছাঁচটা এদের ব্রতের মতো হলেও জোড়াতাড়া দেওয়া কৃত্রিম পদার্থে যে জড়তা সেটা শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির সমস্তটার মধ্যে লক্ষ করা যায়। যজুঃ এবং সামবেদের অনেক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই ব্রতগুলিতে থাকলেও বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে এগুলির কলের পুতুলে আর জীবন্ত মানুষের মতো প্রভেদ, শুধু তাই নয়, যে লৌকিক ব্রতের ছদ্মবেশে এগুলিকে সাজানো হয়েছে সেই খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির সঙ্গেও এদের ওই একই রকম প্রভেদ। খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম-উৎসাহ

ফুটে উঠেছে দেখি। এ দুয়েরেই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এই জন্তে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলি ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্তে ছড়া বলা হচ্ছে। বৈদিক যুগে ঋষিরা উষাকে এবং সূর্যের উদয়কে আবাহন করছেন :

উষাদেবতা। অঙ্গিরাপুত্র কুৎস ঋষি ॥

সূর্যের মাতা শুভ্রবর্ণা দীপ্তিমতী উষা আসিয়াছেন।

সূর্যদেবতা। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি ॥

তাঁহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের উর্ধ্বে বহন করিতেছে।

আবার নদীসকলকে উদ্দেশ ক'রে : কোনো কোনো জল একত্রে মিলিত হয়, অন্ত জল তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের বাড়বানলকে প্রীত করে।

এর পরে যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্যস্তব—

নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ,
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎকারণ।
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়,
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায় ॥

বৈদিক সূর্য আর শাস্ত্রীয় ব্রতের সূর্য, দুয়ে তফাত যে কতটা তা দেখতে পাচ্ছি। এইবার খাঁটি মেয়েলি ব্রতের ছড়াতে সূর্যকে উষাকে এবং নদনদীকে কীভাবে লোকে বর্ণন করছে দেখি।

নদী থেকে জল তোলবার মন্ত্র বা ছড়া

এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি-ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিনকূলে সুখ ॥

সমুদ্রে ফুল-ধরবার মন্ত্র বা ছড়া

সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে ?

সকালের কুয়াশা ভাঙার মন্ত্র

কুয়া ভাঙ্গুম, কুয়া ভাঙ্গুম বেথলার আগে—
সক্কল কুআ গেল ওই বরই গাছটির আগে।

উষা ও সূর্যোদয়ের ছড়া

উরু উরু দেখা যায় বড়ো বড়ো বাড়ি,
ওই যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি!
সূর্যের মা লো! কী কর দুয়ারে বসিয়া!
তোমার সূর্য আসতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।

কিন্তু তাই বলে পুরাণ ভেঙে যেমন শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনি বেদ ভেঙে এই মেয়েলি ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে, এ কথা একেবারেই বলা যায় না। কেননা সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু সূর্য চন্দ্র এঁরা উপাসিত হচ্ছেন—ভারতবর্ষে, ইজিপ্তে, মেক্সিকোতে। সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালির ঘরের জিনিস বলে ধরা যেতে পারে; এটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির সম্পূর্ণ চেহারাটি আমরা যখন দেখব। এক দিকে ভারতে প্রবাসী আর্যদের অনুষ্ঠান, আর-এক দিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, এক দল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন, আর-এক দল নদীমাতৃক পল্লীগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি করছেন। এই প্রবাসী এবং নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্তিতে এবং তারই বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে—তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্তি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ ও পুরাণের চেয়েও যা পুরোনো এই-সব লৌকিক ব্রত-অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই

প্রমাণ করছে—দুই দিকে দুটো বড়ো জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দল-বিশেষের স্বপ্ন।

আর্য এবং আর্য-পূর্ব দুজনেরই সম্পর্ক যে-পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস ; দুজনে ব্রত করছে যা কামনা ক'রে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত-অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি ; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' এর সঙ্গে পৃথিবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি—

বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

এই যে পৃথিবীর যা-কিছু তার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা এবং 'গোক'লে গোকুলে বাস, গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস, আমার যেন হয় স্বর্গে বাস' এই অস্বাভাবিক প্রার্থনা ও স্বপ্ন, এটা বেদেরও নয় ব্রতেরও নয়। বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, বনের সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান ; আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি—কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।

খাঁটি ব্রতের অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এবং শাস্ত্রীয় ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া, দুয়ের মূলত যে ভিন্নতা রয়েছে সেইটে পরিষ্কার ধরবার চেষ্টা করলে দেখব যে, শাস্ত্রীয় ব্রতে প্রায় সকলগুলিতে, যে-কামনা করেই ব্রত হোক-না, কামনা চরিতার্থ করবার উপায় বা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, যেমন—আমলকীদ্বাদশী ব্রত, প্রথম স্বস্তিবাচনপূর্বক "ওঁ সূর্যসোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ

করিয়া সংকল্প করিবে—ওঁ আদ্যেতানি মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী (বা শূদ্র হ'লে দাসী) পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি-ধনধান্যসৌভাগ্যাদি প্রাপ্যন্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য একবর্ষ পর্যন্তং প্রতিমাসীয় শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদি দেবতাপূজাপূর্বকং বা সলক্ষ্মীকবিষ্ণুপূজা-মলকীযুক্তভোজ্যদানপূর্বকং ব্রহ্মপুরাণোক্ত বিধিনামলকীদ্বাদশীব্রতমহং করিষ্যে —পরে সামান্যার্ঘ্য আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি সামান্যকাণ্ডের পুরো অনুষ্ঠান করে ব্রতকথা শ্রবণ—মোটামুটি সব ব্রতেরই এই প্রক্রিয়া। পুত্রপৌত্র কামনা, তারও চরিতার্থতার যে মন্ত্র, যে ক্রিয়া, অন্য-কিছু কামনা করেও সেই-সব ক্রিয়া; কেবল কোনোটা ব্রহ্মপুরাণের মতে একটু-আধটু এদিক-ওদিক ক'রে। সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিন্দুকের একই চাবি!

মেয়েলি ব্রত বা খাঁটি ব্রত তা নয়। সেখানে কামনা যত-রকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত-রকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পূর্ণিপুকুর; সেখানে ক্রিয়া হচ্ছে পুকুর কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল পোঁতা, পুকুরে জল ঢেলে পূর্ণ করা, তার পর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারি ধারে ফুল সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল ধরা—

পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না। ইত্যাদি।

আবার যখন বৃষ্টির কামনা ক'রে বসুধারা ব্রত তখন আলপনায় আট তারা আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো ক'রে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে: এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে—

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদলবদল হয়ে গিয়েছে যে, এখন যে ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং দু-চারটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই। বাংলার ব্রতগুলি কতক-কতক সংগ্রহ হতে আরম্ভ হয়েছে, সবগুলি সম্পূর্ণ আকারে এখনও সংগ্রহ ও প্রকাশ হবার অনেক দেরি, এবং অন্তঃপুরের জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব ব্রত করবার এবং ব্রতগুলির অনুষ্ঠান ঠিকঠাক মনে রাখবার চেষ্টাও ক্রমে চলে গিয়েছে। এ অবস্থায় যা হচ্ছে তাতে খাঁটি নকল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ সবই আমরা গ্রহণ করতে চলেছি। ব্রতের আলপনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই খাঁটি নকশার মধ্যে মেকিও চলেছে। তেমনি ছড়াগুলির মধ্যেও হয়তো যেখানকার যা সেগুলো উলটে কোথাও একছত্র নতুন, কোথাও এক ব্রতের ছড়া অন্য ব্রতে— এমনি সব কাণ্ড। এ ছাড়া নানা গ্রামের নানা অনুষ্ঠান, একই ব্রত এখানে এক-রকম ওখানে অন্য। এমনি সব নানা জঞ্জালের মধ্যে থেকে খাঁটি ব্রতের চেহারাটির একটা আদর্শ বার ক'রে আনতে হলে শুধু এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফল হবে না, পৃথিবীতে সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কীভাবে চলেছে তার ইতিহাসগুলিও দেখা চাই।

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্যব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্যেরা

আসবার আগে এদেশে দলে দলে এই-সব 'অন্ত্যব্রত'—ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ— নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়ভরসা হাসিকান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য এবং না-আর্য বা 'অন্ত্যব্রত'দের মধ্যে সব দিক দিয়ে, এমন-কী, বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদানপ্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদানপ্রদানের ইতিহাস ; ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই, কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেই-সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন-পুরুষ অন্ত্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর ; তার পর, বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর ; তারও তলায় অন্ত্যব্রতদের এই-সব ব্রত—একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন-ভাণ্ডারে।

এই-সব অতি পুরাতন ব্রত এখনও কেমন ক'রে বাঙালির ঘরে ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সদর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে সঙ্গে তো বদলে যায় নি। সেটা কাল, তার পূর্বে, এবং তার—তার—তারও পূর্বে যা আজও তা। অন্তত বেশির ভাগ মেয়েলি কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনির এবং ঠাকুরমাতে ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাত নেই। শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল বার-অ্যাট-ল-র বিয়েও ঠিক সেইভাবেই এখনও ঘটছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও এমনি রোমান ল-র মতো অনেক জিনিসই এখনও অটুটভাবে কাজ করছে দেখা যায়। কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য নয়। বাংলার এই ব্রতগুলি আমাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার অন্ত্যব্রতচারিণীদের জীবন্ত বর্ণনা— কখনো আলপনার শিল্পে, কখনো কবিতা নাটক ও সাহিত্যকলার মধ্যে দিয়ে, কখনো বা ধর্মানুষ্ঠানের দিক

দিয়ে। এই ছবির উপরে কালে কালে যে-সব নানামুনির আঁচড়, নানা দিক থেকে নানা জঞ্জাল পড়েছে, সেগুলিকে আস্তে আস্তে না সরিয়ে দেখলে আমরা কিছু যে দেখতে পাব তা তো বোধ হয় না।

মেয়েদের মধ্যে ব্রতগুলি এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকেই ব্রত অনুষ্ঠানের আদর্শ বলে নিতে পারি কিনা প্রথমে সেটা দেখা যাক; এবং সেটা যদি আদর্শ ব্রত না হয় তবে ব্রতের আদর্শটা পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাই কিনা দেখি। মানুষের এবং সব জীবেরই, বিচিত্র কামনা চরিতার্থ হবার পূর্বে বিচিত্র চেষ্টায় আপনাকে ব্যক্ত করে। তৃষ্ণা জাগল, জলপান ক্রিয়াটি করলেম, তৃষ্ণার শান্তি হল। ক্ষুধা বা খাবার কামনা জাগল, আহার্য-সংগ্রহ, রন্ধন-ব্যাপার, পরিবেশন ও ভোজন-ক্রিয়া করলেম, ক্ষুধার শান্তি হল। ধনের কামনা জাগল, কাজ করতে দেশবিদেশে চললেম—এইভাবে মানুষ আজীবন কামনা ও তার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে চলেছে। কী অনুষ্ঠান করলে যে কী হবে তার কতক মানুষ আপনা হতেই আবিষ্কার করে, কতক দেখে শিখে নেয় কতক ঠেকে শিখে নেয়—এমনি। জীবনের কামনা যতক্ষণ না মরণে গিয়ে থামছে ততক্ষণ, ধরতে গেলে, সমস্ত জীবজন্তুতে মিলে বিশ্বব্যাপী একটা ব্রত-অনুষ্ঠান করছে। জলের কামনা করছি কিন্তু উঠে গিয়ে জলের ঘটিটা না ধরে, ঘরে বসে জলখাবার ভঙ্গিটা অনুষ্ঠান করছি। কিংবা, জলের কামনায় চলেছি উনুনের ধারে—এ হলে কামনা চরিতার্থ হল না, কাজেই যে অনুষ্ঠান করলেম সেগুলো ভুল অনুষ্ঠান হল। ব্রতে জলের কামনা জলরূপে এবং পানক্রিয়া হয়ে ফোটা চাই। এবং যখন এটা হল তখনই কামনায় ক্রিয়া যোগ হয়ে ঠিক ফলটি পাওয়া গেল। মানুষের এই সহজ বিবেচনার ছাঁচেই কতকটা তাদের আদিকালের ব্রতগুলি ঢালা হয়েছে দেখা যায়।

একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক উদ্দেশে করছে।

ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠছে। একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন যে মিলছে, কেন যে একের অনুকরণ দশে করছে, সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নে এখন যাব না। একজনকে নিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত-অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর-একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত— কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাত। ব্রত যে কী ও ব্রত যে কেন তা এদেশের এবং অন্য দেশের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আমেরিকার 'হুইচল' জাতির মধ্যে বৃষ্টি কামনা করে একটি ব্রত: একটি মাটির চাকতি বা সরা; তার একপিঠে আলপনা দিয়ে সূর্যের চারি দিকে গতি-বিধি বোঝাতে ক্রশের মতো একটা চিহ্ন; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্যদিনের সূর্যকে বুঝিয়ে; এরই চারি দিকে সরার কিনারায় সব পর্বতের চূড়া, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধানখেত বোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু; তারই ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্য পিঠে লাল-নীল-হলদে রঙের বাণে-ঘেরা চক্রাকার সূর্যমূর্তির আলপনা লিখে পূজাবাড়িতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আলপনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয়তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।

আমাদের দেশের একটি ব্রত 'ভাদুলি'। এটি বৃষ্টির পরে আত্মীয়স্বজনের বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে, জলপথে স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায়। ভাদুলির মূর্তি, জোড়াছত্র মাথায়, জোড়ানৌকায় লিখে, চারি দিকে নদী সমুদ্র কাঁটাবন নানা হিংস্র জন্তু নৌকো ইত্যাদি আলপনায় দিয়ে, এই ব্রত করা হয়। এক-একটি আলপনার চিত্রে ফুল ধ'রে, এবং সেই আলপনা যে কামনার প্রতিচ্ছবি একটির পর একটি ছড়ায় সেই কামনাটি উচ্চারণ ক'রে—যেমন নদীর আলপনায় ফুল ধ'রে বলা "নদী, নদী! কোথায় যাও? বাপ-

ভায়ের বার্তা দাও!"—এমনি প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন আলপনাতে রকম-রকম ছড়া ব'লে ফুল ধ'রে ভাদুলিকে প্রণাম করে ব্রত শেষ। যেমন এই ব্রতে তেমনি অন্য অন্য ব্রতেও কখনো ফুল, কখনো সিঁদুরের কৌটা, এমনি নানা জিনিস এক-একটি আলপনার উপরে রেখে ছড়া-কাটা ও শেষে ব্রতকথা শোনা হচ্ছে এদেশের ব্রত করা। ব্রতের ফুল ধরায় আর পূজার ফুল দেবতার চরণে দেওয়ায় একটু তফাত রয়েছে। ব্রতে ফুল ধরার অর্থ এ নয় যে নদীকে কি বাঘ মোষ ইত্যাদির চিত্রমূর্তিকে ফুল দিয়ে উপাসনা; নদীর কামনা শেষ, বনের কামনা শেষ, এইটে মনে রাখবার জন্যেই ফুলটা—কতকটা হিসেবের খাতায় লাল পেনসিলের দাগ, গণনা ঠিক রাখতে। যার উপর ফুল পড়ল তিনি সাক্ষী রইলেন যে ব্রতী তার কামনা জানিয়েছে; যেমন বসুধারা ব্রতের ছড়াটিতে স্পষ্ট বলা হয়—

অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফল আমরা রাখি।
অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি।

দুই দেশের দুটি ব্রতের মধ্যে একই জিনিস কতকগুলি রয়েছে। কিছু কামনা করে দুটোই করা হচ্ছে। কামনার প্রতিচ্ছবি আলপনায়; যেমন জলপথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আলপনায় ব্যক্ত হচ্ছে। তেমনি কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; যেমন—"নদী নদী! কোথায় যাও? বাপভায়ের বার্তা দাও।" এই হল—জলযাত্রীর খবর যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্রতের পর সকল ব্রতীরা মিলে ব্রতকথা শোনা। ব্রতের এ অংশটার সঙ্গে কামনার যোগাযোগ এবং অনুষ্ঠানেরও যোগাযোগ ততটা নেই। কেননা দেখি, কোনো ব্রতে কথা আছে, কোনো ব্রতে নেই; এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম শেষ করে গল্পগুজব করা—গ্রামের পাঁচজনে মিলে। ব্রতে এই-সবই রয়েছে—কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডনশিল্প। এর মধ্যে ছড়াগুলি সব এক-রকম

নয়; কোথাও দেখব সেগুলি নাটকের মতো পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্ক -ভেদে সাজানো। যদিও খুব ছোটো কিন্তু এই-সব ছড়াকে অভিনয় করার উদ্দেশ্যেই যে গাঁথা হয়েছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। ব্রতগুলিকে সম্পূর্ণ আকারে যখন দেখব তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে সেটা নাটক কি ছড়া। ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা নাট্যকলা নৃত্যকলা গীতকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্যন্ত পাচ্ছি। কাজেই ব্রতগুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ জিনিস নয় এবং শিল্প ও আর-আর সভ্যতার লক্ষণ যাদের মধ্যে পাওয়া শক্ত এমন কোনো বর্বর জাতির অন্ধবিশ্বাসের নিদর্শন বলেও এগুলিকে ধরব না।

আর্যেরা যাঁদের অন্যব্রত অকর্মা দস্যু দাস ইত্যাদি বলেছেন, এই-সব ব্রতে এবং ভারতবর্ষের শিল্পকলার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সেই-সব অন্যব্রতদের সম্বন্ধে অন্য-রকম সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি। যেমন বাস্তুবিদ্যা, ময়শাস্ত্র, এবং ময় ছিলেন দানব। আর্যেরা যখন ইন্দ্রকে হোম করে যুদ্ধ-বিজয়কামনা করছেন, ততক্ষণ অন্যব্রতরা তাদের পুরীসকল অস্ত্রশস্ত্রে, পাষাণপ্রাচীরে সুদৃঢ় করে তুলছে—ইন্দ্রকে খুশি করতে বসে না থেকে। এবং সে সময় তাদের মেয়েরা যে কী ব্রত করছে তারও কতকটা আভাস 'রণে এয়ো' ব্রতের এই ছড়াটি থেকে আমরা পাচ্ছি: রণে রণে এয়ো রব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব। এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অন্যব্রত হলেও আর্যদের চেয়েও যে সভ্যতায় নীচে ছিল তা তো বলা যায় না। রণচণ্ডীর যে মূর্তিখানি এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, মেয়েদের হৃদয়ের যে একটি সংযত সুশোভন আদর্শ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাতে করে তাঁদের অন্যব্রত ছাড়া অকর্মা অমন্ত এ-সব উপাধি দেওয়া চলে না।

ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্যজাতি এই-সব অন্যজাতির চেয়েও বেশি দূর অগ্রসর হন নি। জগৎ-সংসারের এক নিয়ন্তাকে স্বীকার বৈদিক আর্যদেরও মধ্যে অনেক দেরিতে ঘটেছে। তার পূর্বে জলের এক দেবতা, আগুনের

দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, এমন-কী মণ্ডুক পর্যন্ত। অন্যব্রতদের মধ্যেও এই-সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখি। যেমন বেদের 'সূর্য' ইজিপ্তে 'রা' অথবা 'রাআ', মেক্সিকোতে 'রায়মী', বাংলায় 'রায়' বা 'রাঈ'। বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অন্যব্রতদের মধ্যে খুঁজে পাব। নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই-সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্যকামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে কী আর্য কী অন্যব্রত সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ব্রত-অনুষ্ঠানের, আর-এক পরিচ্ছেদ আমরা পড়তে পাই। লোকে আর্যধর্মের চরম এক-নিয়ন্তার নিষ্কাম উপাসনায় পৌঁছে হিন্দুধর্মের নানা দেবদেবী আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে, সেই প্রাচীন অবস্থায়, সেই অন্যব্রতদের সমান অবস্থায় আর-বার ফিরে যাচ্ছে মনের গতি। কেবল এইটুকু তফাত যে, এখানে অন্যব্রতদের দেবতাকে এবং সেই সেই দেবতার ব্রত-অনুষ্ঠানকে আর্যদের মতো সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে তাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। হিন্দুধর্মের এই উদারতার পিছনে রয়েছে সম্পূর্ণ অনুদার ভাবটি—সবাই নিজের নিজের ধর্মাচরণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আসুক এক হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের কবলে; এবং এরই জন্য শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়াজালের মতো দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারেরাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন; যেমন ব্যাসদেব বলছেন—"দেশানুশিষ্টং কুলধর্মমগ্রং, সগোত্রধর্মং নহি সংত্যেজেচ্চ।" অর্থাৎ, ধর্মশাস্ত্র অবিরোধী; যে দেশব্যবহার সেইটেই প্রথম পালনীয়, কিন্তু সগোত্র ধর্মও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। স্মার্ত রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে স্ত্রীলোকদের হিন্দু-অনুষ্ঠেয় কার্যে অর্থাৎ যে যে কার্য তারা ধর্মবোধে করে আসছে অথচ মুনিপ্রণীত কোনো বচন-প্রমাণে যে-সকল ব্যবহার ও ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না তা "যোষিৎব্যবহারসিদ্ধা" বলে ধরেছেন।

পশ্চিম-দেশে হোলির উৎসব একটি অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। এই হোলি-উৎসব বা বসন্তের ব্রতকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে ধরার জন্যে মীমাংসা-দর্শনে হোলিকাধিকরণ বলে একটা অধ্যায় লিখতে হয়েছে। এবং এই অধ্যায়ে যে-সমস্ত হিন্দুর ধর্মকর্মের বা ব্যবহারের বেদাদিশাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায় না, সে-সমস্তই হোলিকাধিকরণন্যায়-মূলক-সিদ্ধ বলা হয়েছে। এটিকে হিন্দুশাস্ত্রকার মেনে নিলেন এবং এর সঙ্গে সমস্ত লৌকিক ব্রতকে হিন্দুর বলে স্বীকার করেও নিলেন দেখছি; কিন্তু শুধু এইখানে শাস্ত্রকারদের কর্ম শেষ হল না, পুরনো বা অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলোর রূপান্তর করে শাস্ত্রীয় বলে চালাবার চেষ্টাও হয়েছে দেখি। আবার নতুন নতুন ব্রত, নিজেদের মনগড়া, তাও সৃষ্টি হচ্ছে দেখা যায়। যেমন অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী, এমনি কতকগুলি ব্রত তিথিমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত বিশেষ তিথিতে যদি কোনো পুণ্যকার্য করা যায় তবে তার দ্বারা মানুষের পুণ্য অর্জন এবং সৌভাগ্য ঘটে—এই হল ব্রতগুলির মোট কথা। আর কতগুলি ব্রত হিন্দুদের দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য। যেমন অনন্তব্রত ইত্যাদি। কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত— পুত্রকামনা, সর্পভয়নিবারণ, এমনি সব কামনা ক'রে; এগুলি মেয়েরাই করে। যেমন অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, নিত্যষষ্ঠী, সুবচনী, শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মূলাই ইত্যাদি।

এই-সব গ্রাম্যদেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে; যেমন কার্তিকের ব্রত। ষষ্ঠীদেবী পুত্রদান করেন, কার্তিকও তাই। তার পর কতকগুলি ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত—যেমন দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি, ধন-গোছানো এগুলি কেবল নৈবেদ্য ও দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারিরা সৃষ্টি করেছে। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান, সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন, ঘৃত দাড়িম্ব এই-সব জিনিস বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়— এই ব্রতগুলির মূলকথাটা এ ছাড়া আর-কিছুই নয়। তার পর কতকগুলি ব্রত

সম্পূর্ণ মেয়েদের সৃষ্টি; যেমন আদরসিংহাসন—স্বামীর আদর কামনা করে একটি স্বামীসোহাগিনীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আদর-আপ্যায়নে খুশি করা—এবং আরও অনেক অশাস্ত্রীয় ব্রত, ঋতুর উৎসব, এর মধ্যে আসছে। এই যেগুলি সম্পূর্ণ মেয়েদের ব্রত, এইগুলিই হল লৌকিক বা লোকপরম্পরায় পুরাকাল থেকে দেশে চলে আসছে। এর মধ্যে শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুয়েরই জায়গা নেই। যদিও এই-সব ব্রত অনেক শাস্ত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছে তবু এখনও অনেকগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা লৌকিক ব্রতের স্থান কেমন করে দখল করতে চাচ্ছে নতুন নতুন ব্রত এবং নিজেদের শাস্ত্র ও দেবদেবীকে এনে, সেটাকে খুঁটিয়ে দেখতে হলে আর-একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখতে হয়; সুতরাং দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা বোঝাব।

আদরসিংহাসন ব্রত, এটি সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্রত; মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামীসোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্নপূর্বক নিজগৃহে ডাকিয়া আনিয়া পিঠালির দ্বারা বিচিত্র সিংহাসন রচনা করিয়া তাহাকে উপবেশন করাইবে, নাপিতাঙ্গনা দ্বারা হস্তপদের নখাদি ছেদন করাইয়া অলক্তকরাগে চরণদ্বয় রঞ্জিত করাইয়া দিবে এবং তৈল হরিদ্রা ও কবরীবন্ধনকরত সীমন্তদেশ সিন্দূররাগে রঞ্জিত করিবে এবং পুষ্পমালা প্রদানপূর্বক সুগন্ধদ্রব্য গাত্রে লেপন করিবে, পরে মনোহর দ্রব্যজাত সমাদরপূর্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিবে। এইরূপে সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিবস এক এক জন অথবা একজনকেই আদর-অভ্যর্থনা ও অর্চনা, বর্ষ-চতুষ্টয় পূর্ণ হইলে উদ্‌যাপন।—স্বামীর সোহাগ কামনা ক'রে এই মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পুজারি ব্রাহ্মণদের লোভ হল; অমনি তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন ব্রাহ্মণাদর: মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন এক এক অথবা একই ব্রাহ্মণকে নানা উপকরণে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে; চারি বৎসরে উদ্‌যাপন। এমনি মধুসংক্রান্তি, মিষ্টসংক্রান্তি—নিজের কথা মিষ্ট হবে এবং শাশুড়ি-ননদের বাক্যযন্ত্রণা সইতে হবে না এই কামনা করে মেয়েরা যেমনি নিজেদের মধ্যে ব্রত করেছে অমনি মধু আর মিষ্টান্নের চারি দিকে ব্রাহ্মণ-

মাছি আস্তে আস্তে এসেছে দেখি—'ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীতসহ লড্ডুক দান করো' ব'লে।

তারপর গ্রাম্যদেবতার পুজোগুলি, যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপির এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানের পিরকে লোকে যেমনি পুজো দিতে আরম্ভ [করল] অমনি তাঁকে সত্য-নারায়ণ ব'লে প্রচার ক'রে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন। কিন্তু বাংলায় সত্যনারায়ণের যে পাঁচালি তাতে পিরকে মুসলমানি পোশাকেই দেওয়া হয়েছে। কথা পর্যন্ত উর্দু, যেমন—জয় জয় সত্যপির সনাতন দস্তগির ইত্যাদি। এই মুসলমান পিরের উপাসনা ও শিরনি ভট্টাচার্যদেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে, কিন্তু এরই মধ্যে বাংলায় আজকাল ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা এই ব্রতে মুসলমানি অংশটাকে একেবারে চেপে দেবার চেষ্টায় রয়েছেন। "ব্রতমালাবিধান"এর ভূমিকায় ভাটপাড়ার শ্রীবীরেশনাথ শর্মা লিখছেন, "সত্য-নারায়ণের বাংলা পাঁচালি বহু পুরোহিতের অসম্মত বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহা সন্নিবেশিত করিলাম না।" পিরের শিরনি বা ভোগটা হচ্ছে সুজি বাতাসা, হিন্দুয়ানিতে বাধে না এমন-সব জিনিস; এবং পায়েসের দলে সেটা প্রায় চলে গেছে। এখন, বাংলা পাঁচালি, যেটা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত সহজে বুঝতে পারে যে পির তিনি পিরই—বিষ্ণুও নন সত্যনারায়ণও নন, সেই পাঁচালিটাকে লোপ করে দিতে পারলেই সত্যনারায়ণের হিন্দুত্ব নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে।

আর-কতকগুলি ব্রত; যার নামটা রয়েছে পুরনো কিন্তু ভিতরের মাল-মসলা সমস্তই নূতন— যেভাবে পেটেন্ট ওষুধের নকল হয়ে থাকে কতকটা সেইরূপে কুক্কুটীব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোটনাগপুরের পার্বত্যজাতির এ ব্রতটি; কুক্কুটী হলেন তাদের দেবী। এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে, তেমনি কুক্কুটী দেবীকেও এককালে লোকে পুজো দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবৎসা-দোষনিবারণ এবং তেজস্বী বহু সন্তান-লাভ হচ্ছে কুক্কুটীব্রতের ফল। আমাদের শাস্ত্র এটিকে যেমন করে গড়ে নিয়েছে তাতে ব্রতকথার সঙ্গে

অনুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানের যে সংকল্প তার সঙ্গে ব্রতকথার যে কামনা তারও মিল নেই। সংস্কৃত অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে সংকল্প হল, যথা—আদ্যেত্যাদি ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবরভ্য যাবজ্জীবপর্যন্তম্ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পাষণ্ডধর্মরাহিত্যপুত্রপৌত্রধনধান্যাতুলসর্বসম্পত্তি-প্রাপ্তিপূর্বকং শিবলোকপ্রাপ্তিকামা যথাশক্তি যথাজ্ঞানং ভবিষ্যপুরাণোক্তকুক্কুটী-ব্রতমহং করিষ্যে। পাছে কুক্কুটীব্রত করে অহিন্দুপুত্রসন্তান হয়, সেজন্য আগেই সাবধান হওয়া হচ্ছে—'পাষণ্ডধর্মরহিত পুত্র' যেন হয়। তার পর 'শিবলোক-প্রাপ্তি'। সেখানে কুক্কুটের আদিপুরুষ যে ময়ূরের ছানা, তর্কের বেলায় চাই কি তাঁকে হাজির করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাবে আটঘাট বেঁধে পণ্ডিতেরা ব্রতকথাটিকে কাটাছাঁটা করতে বসলেন। ব্রতকথাগুলি হচ্ছে ব্রতটির উৎপত্তির ইতিহাস। সেটাকে ঠিক রাখলে তো ধরা পড়বার সম্ভাবনা; এবং ব্রতকথাটা চলতি ভাষায় বলা চাই, কাজেই ব্রতীর কামনা ও ব্রতের ফলাফল সেখানে ঠিকঠাক বজায় রাখা দরকার। শাস্ত্র এই সমস্যার যে ভাবে মীমাংসা করলেন তা এই: ফলটি পরিষ্কার রইল—মৃতবৎসা-দোষনিবারণ হয়, দীর্ঘজীবী পুত্র হয় এবং সুখে কালাতিপাত ও অন্তে শিবলোক। এ কটা বেশ সহজে মিলিয়ে দিয়ে পণ্ডিত ব্রতের উৎপত্তি নিয়ে পড়লেন। রাজা নহুষের রানী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিত-পত্নী মালিকা দেখলেন সরযূতটে উর্বশী, মেনকা এঁরা হাতে আটটি সুতোর আটপাট-দেওয়া ডোরা বেঁধে শিবপুজো করছেন। রাণীর প্রশ্নে অপ্সরাসকল উত্তর দিলেন, তাঁরা কুক্কুটীব্রত করছেন। রানী স্বচক্ষে দেখলেন শিবপুজো হচ্ছে কিন্তু শুনলেন যে সেটা কুক্কুটীব্রত। গল্পের বাঁধুনিতে মস্ত একটা ফাঁকি রয়ে গেল। তার পরে মালিকা আর চন্দ্রমুখী ব্রতের অনুষ্ঠান-প্রণালী জেনে নিলেন। এখানে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটাই দেওয়া হল। তার পর ব্রতের নামটা কেন যে কুক্কুটীব্রত হল তার একটা মীমাংসা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করলেন—রানী চন্দ্রমুখী ব্রত করতে ভুললেন এবং মালিকা ভুললেন না। সেই ফলে চন্দ্রমুখীসুন্দরী হলেন বানরী, এবং মালিকা হলেন কুক্কুটীব্রতের ফলে জাতিস্মরা কুক্কুটী।

তার পর জন্মে জন্মে মালিকা ব্রত করে সুখে থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান; শেষে একদিন মালিকা দয়া করে চন্দ্রমুখীকে আবার ব্রত করতে শেখালেন। কুক্কুটীজন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন, সেইজন্য ব্রতের নাম হল কুক্কুটীব্রত। ব্রতকথা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যে-সব ফাঁকি সেগুলো যে পণ্ডিতেরা ধরতে পারেন নি তা নয়। ফসকা-গেরোকে আরও গেরো দিয়ে তাঁরা কষে কুক্কুটীব্রতের সবটাকে ভবিষ্যপুরাণের সঙ্গে বাঁধলেন; ব্রতকথা আরম্ভ হল—শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বার বার পুত্রশোকে দেবকী রোদন করছেন দেখে লোমশ মুনি তাঁকে এই কুক্কুটীব্রতকথা বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এ এক-রকমের প্রক্রিয়া, যেখানে ব্রতের নাম হুবহু বজায় রেখে তার অনুষ্ঠান ও উৎপত্তির ইতিহাস একেবারে বদলে ফেলা। আর-এক রকমের কারিগরি হচ্ছে নামটা পুরো নয়তো আধাআধি বদলে দেওয়া—অনুষ্ঠান অনেকটা বজায় রেখে। প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রা'লদুর্গা ব্রতটি। হরপার্বতী পাশা খেলছিলেন; হঠাৎ শিব পাশা ফেলে বললেন, "কার জিৎ?" দুর্গা বললেন, "কার জিৎ?" বড়ুর ব্রাহ্মণ ছিলেন পাশে, বলে উঠলেন, "মা'র জিৎ।" অমনি শিবের অভিসম্পাতে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি। দুর্গার দয়া হল। তিনি তাঁকে সূর্য-অর্ঘ্য দিয়ে রা'ল-দুর্গার ব্রত করতে শিখিয়ে দিলেন। এখানে সূর্যও রইলেন, দুর্গাও রইলেন। সূর্যের প্রাচীন নাম রা' বা রা'ল, বোঝালে এটি সূর্যপূজা; কিন্তু "রা'লদুর্গা" বললে এটি দুর্গার ব্রত। এইভাবে 'অথ ব্রতোৎপত্তি' বিবরণ লেখা হল দুই দেবতারই মান বজায় রেখে, যেমন—

নমঃ নমঃ সদাশিবি তুম প্রাণেশ্বর।
ভক্তিবাহনে প্রভু দেব দিবাকর।
হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।
যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার।
শুন সবে সর্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়োই আশ্চর্য কথা সূর্যের চরিত। ইত্যাদি

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কী কী প্রক্রিয়ার ফল তার কতকটা আভাস পাওয়া গেল। সব ব্রতগুলিকে সমগ্রভাবে দেখার কাজ বড়ো সহজ নয়। প্রকাণ্ড একটা ব্রতপ্রকরণ না লিখলে শাস্ত্রপুরাণের জট ছাড়িয়ে আমাদের দেশের হিন্দুধর্মের পুরাণের পূর্বেকারও ব্রতগুলির নিখুঁত চেহারা বার ক'রে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি যে 'আর্যগৃহের এবং আর্যহৃদয়ের ছবি নয়, সেটা ঠিক। আর্যের চেয়ে বরং অনার্যের—অন্ত্যব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই-সব ব্রতের আলপনায়, ছড়ার ব্রতকথায় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনার্য-অংশ শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলোকে হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্রমন্ত্রের আবরণে ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু সব সময়ে সে চেষ্টা সফল হয় নি দেখি।

লক্ষ্মীব্রতটি মেয়েদের একটি খুব বড়ো ব্রত। আশ্বিনপূর্ণিমায় যখন হৈমন্তিক শস্য ঘরে আসবে, তখনকার ব্রত এটি। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপূজা। সকাল থেকে মেয়েরা ঘরগুলি আলপনায় বিচিত্র পদ্ম, লতাপাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা এবং ধানছড়া হল আলপনার প্রধান অঙ্গ। বড়ো ঘর, যেখানে ধানচাল, জিনিসপত্র রাখা হয়, সেই ঘরের মাঝের খুঁটির—মধুম খামের গোড়ায় নানা আলপনা-দেওয়া লক্ষ্মীর চৌকি পাতা হয়। আলপনায় নানা অলংকার, এবং চৌকিতে, লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না লিখে কেবল মুকুট আর দুখানি পা কিংবা পদ্মের উপরে পা—এমনি নানা-রকম চিত্র দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মীনারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা পদ্ম, ধানছড়া, কলমিলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল ও বেড়—ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিঁদুরের কৌটা এবং তার উপরে নানারকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ রচনার পাতিল বা ভাঁড় রাখা হয়। রচনার পাতিলখানির গায়ে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ও ধানছড়া; রচনার পাতিলটির উপরে লক্ষ্মীর সরা; সরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলদে কালো এই কয় রঙে লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদির আলপনা। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রঙ, গায়ে হলুদবর্ণ, কালির পরিরেখ, এবং অধর ও পায়ের এবং করতলের জন্য লাল; নীলবর্ণ পটভূমিকার কারুকার্যে

লক্ষ্মীপুজার মাঝের খুঁটির গোড়ায় আলপনা : পদ্ম, ধানছড়া, কলমিলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

দেওয়া হয়। লক্ষ্মীসরার উর্ধে আধখানা নারিকেলের মালই—মেয়েরা এই মালইকে কুবেরের মাথা বা মাথার খুলি বলে। যশোর অঞ্চলে সবার পশ্চাতে একটি শীষ সমেত আস্ত ডাব—সেটিকে ঘোমটা দিয়ে, গহন ইত্যাদি দিয়ে অনেকটা একটি ছোটো মেয়ের মতো করে সাজানো হয়। এবং কলার খালুই নিয়ে ধানের গোলার অনুরূপ কতকগুলি ডোলা, তাতে নানাবিধ শস্য পূর্ণ করে আর একটি কাঠের খেলার নৌকোর প্রত্যেক গলুয়ে নানাবিধ শস্য—ধান, তিল, মুগ, মুসুরি, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সম্মুখে রাখার প্রথাও আছে। পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্রতীর উপবাস। দেশভেদের কোনো গ্রামে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবের—এই তিনটিকে তিন রঙের পিটুলির পুতুলের আকারে গড়ে দেওয়া হয়। এমনি নানা গ্রামে অনুষ্ঠানের একটু অদলবদল আছে।

মোটামুটি হিসেবে দেখা যায়, এই কোজাগরপূর্ণিমার ব্রতটির

মধ্যে অনেকখানি অনার্য অংশ রয়েছে। শুয়োরের দাঁত—যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনার পাতিল; কুবেরের মাথা—যেটা সব-উপরে রয়েছে দেখি; কিংবা সরার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ের মতো ডাব—হলুদ-সিঁদুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া—এক লক্ষ্মীর বাহন, আর এক লক্ষ্মীর শস্যমূর্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্ত্যব্রতদের। আমার এই কথা সমর্থন করার জন্যে হিন্দুস্থানেই যদি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় তবে একটু মুশকিল। কেননা, শুয়োরের দাঁত—সে বরাহ-অবতারের যুগে বেদ উদ্ধার করে পবিত্র হয়ে গেছে; মড়ার মাথা—সেও তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মহাদেবের হাতে উঠেছে; বাকি থাকেন পেঁচা ও ধানছড়া; হয়তো গরুড়ের বংশাবলীতে পেঁচাকেও পাব, এবং ধানই যে লক্ষ্মী, সেটা তো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে লুকোনো আছে। কিন্তু ভারত-সমুদ্র ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রশান্ত-মহাসাগরের পারেও যখন দেখি, ধানছড়া মূর্তিতে পুজো পাচ্ছেন ঠিক এমনি আর-এক মা-লক্ষ্মী বা 'ছড়া-মা' মেক্সিকো পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্যদের মধ্যে, তখন কী বলা যাবে?

শস্যসংগ্রহের কালে পেরুতে লোকেরা ভুট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের মা-লক্ষ্মীর মূর্তিটি গড়ে। পুজার পূর্বে তিন রাত্রি জাগরণ করে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মাকে নজরে-নজরে রাখা নিয়ম। একে পূর্ণিমা-জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পুজোর দিন এরা ভুট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্তির সামনে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিদ্ধ-করা ব্যাঙ সকলের উপরে রাখে; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শীষের মধ্যে নানা শস্য—ভুট্টা, মুগ, মুসুরি ইত্যাদি চূর্ণ করে ভরে গুঁজে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে মেয়েরা এলোচুলে নৃত্য করতে করতে একটি কুমারীকে হলুদে-সিঁদুরে অলকা-তিলকা দিয়ে মুখটি সাজিয়ে—কতকটা আমাদের লক্ষ্মীপুজোর ভাবটির মতো—এবং নানা অলংকার ও ভালো কাপড় পরিয়ে পুজারির সামনে উপস্থিত করে। পুজারি কুমারীকে পুজা দেন ও সকলের একসঙ্গে নরবলির নাচ শুরু হয়। তার পরে সেই কুমারীকে বলি দিয়ে তার সদ্যছিন্ন

বসনভূষণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদি

রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটি রচনার পাতিলে রেখে পুরোহিত ছড়ামাম্মাকে প্রশ্ন করেন—মা, তুমি তুষ্ট হয়ে রইলে তো? যদি পুরোহিতের প্রতি আদেশ হয়—রইলুম, তবে জনারের ছড় তারা পূজার ঘরে তুলে রাখে, আর যদি আদেশ হয়—রইব না, তবে জনারের ছড় পুড়িয়ে নতুন ছড়ামাম্মার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়।

লক্ষ্মীপূজার এদেশে আর-একটা অনুষ্ঠান রয়েছে, যেটা নজর করে দেখলে শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীপূজা-পদ্ধতি যে অনার্য এবং প্রাচীন লৌকিক একটি ব্রতের স্থান পরে অধিকার করেছে, তা বেশ বোঝা যায়। গৃহস্থের বড়ো-ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার পূর্বে, ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় 'অলক্ষ্মী বিদায়'। এটি শাস্ত্রোক্ত দীপান্বিতা। লক্ষ্মীপূজার একটি অনুষ্ঠান, যথা; প্রদোষসময়ে বহির্দ্বারে গোময়নির্মিত অলক্ষ্মীকে বামহস্ত দ্বারা পূজা করিবে। আচমনান্তে সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া অলক্ষ্মীর ধ্যান যথা—ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং কৃষ্ণগন্ধানুলেপনাং তৈলাভ্যক্ত-শরীরাং মুক্তকেশীং দ্বিভুজাং বামহস্তে গৃহীত ভস্মনীং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীং গর্দভারূঢ়াং লৌহাভরণভূষিতাং বিকৃতদ্রংষ্ট্রাং কলহপ্রিয়াম্—এই বলিয়া ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্বক অলক্ষ্মীর পূজা; পূজান্তে পাঠ্য মন্ত্র যথা—ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজ্যঞ্চ শাশ্বতীম্। পরে গৃহমধ্যে গিয়া লক্ষ্মীপূজা যথাবিধি আরম্ভ—গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালংকারভূষিতাম্ ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা অলক্ষ্মী-বিদায় নিজেরা করে না; পূজারিকে দিয়ে এ-কাজ সারা হয়। এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্ত্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্যদেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা-কুৎসিতা বলে একে ছেঁড়া চুল ও ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন। মেয়েরাও ব্রহ্মকোপের ভয়ে অলক্ষ্মীর পুজোর জায়গা বাইরেই করলেন; এবং যথাবিধি পূজা করা না-করার দায়-দোষ সমস্তই পূজারিরই নিতে হল এবং এখনকার হিন্দু-পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের শালগ্রাম-

ফেলার মতো তখনও একটু যে গোলযোগ না হল তা নয়। মেয়েরা পুজারির কথা শুনে প্রাচীনা লক্ষ্মীকে বেশিরকম অপমান করতে ইতস্তত করলেন। এখন অলক্ষ্মীই বলি আর যাই বলি, একসময়ে তিনি তো লক্ষ্মী বলেই চলেছিলেন, কাজেই তাঁর কতকটা সম্মান ধূর্ত পুজারি বজায় রেখে মেয়েদের মন রাখলেন: নিজেরও মনে অলক্ষ্মীর কোপের ভয় না-হচ্ছিল তা নয়; ঘরের বাইরে হলেও মা-লক্ষ্মীর আগে অলক্ষ্মীর পুজা হবে, স্থির হল।

লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে কলার পেটোর উপরে তিনটি পিটুলির পুতুল সবুজ হলুদ লাল তিন রঙে প্রস্তুত করে রাখা হয়। এই পুতুলগুলিও অনার্য লক্ষ্মীপূজার নিদর্শন। এই তিন পুতুলকে বলা হয়—লক্ষ্মী, নারায়ণ আর কুবের। কিন্তু এরা আসলে যে কী তা আমরা দেখব। সবুজ হলদে লাল পুতুল, আর অলক্ষ্মী-বিদায়ের ছেঁড়া খানিক মাথার চুল—এইগুলির কোনো অর্থ অন্যদেশের ধর্মানুষ্ঠানে পাই কিনা দেখি। মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপুজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয়— শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা-গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।—

The women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long.[১]

মেক্সিকোর পুরাণে আরও দেখা যাচ্ছে, শস্যের রক্ষয়িত্রী তিন বর্ণের তিন দেবতা। একজন অপক্ব হরিৎ শস্যের সবুজ, এক ফলন্ত স্বর্ণশস্যের হলুদ, এবং আর-এক আতপতপ্ত সুপক্ব শস্যের সিন্দূরবর্ণ।

মেক্সিকোতেও শস্যের নানা অবস্থায় এক-এক দেবী রক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে Centeotl এবং তাঁদের একজন Xilonen সবুজ, অপক্ব-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী—

A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or

১ Myths of Mexico and Peru. p. 85

other of the various aspects of the Maize plant...Xilonen —the typified the xilote or green ear of the Maize.[১]

আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড়ো লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন প্রথম ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্বে। চাষিরাই বেশি এ ব্রত করে—রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে। একে বলা যেতে পারে হরিতা-দেবী— সবুজবর্ণ। এই পূজা ক'রে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর-পূর্ণিমায় যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী, হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অগ্রানে, যখন পাকা ধান ঘরে এসেছে—ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরও কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করেন, যেমন ভাদ্রে, কার্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি ঐ তিন লক্ষ্মীব্রতেরই ছাঁচে ঢালা। দেখা গেল, প্রাচীন লক্ষ্মীব্রতের অনার্য কতকটা গেল ঘরের বাইরে, যেমন অলক্ষ্মী; কতক রইল ঘরের মধ্যে, যেমন কুবেরের মাথা ও তিন পুতুল ইত্যাদি। সব চেয়ে বড়ো লক্ষ্মীপুজো কোজাগরপূর্ণিমায়। তারই ব্রতকথা থেকে বেশ বোঝা যায়, অলক্ষ্মী আর লক্ষ্মী দুই দেবতার পুজো নিয়ে দেশের মধ্যে একসময় বেশ-একটু গোলযোগ চলেছে। কথাটি এই :

এক দেশের রাজার নিয়ম ছিল হাটে কেউ কিছু যদি বিক্রি করে উঠতে না পারত, তবে তিনি রাজভাণ্ডার থেকে হাট শেষ হলে হতাশকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ঝড়তিপড়তি সবই নিজের জন্যে কিনে রাখতেন। এমনি একদিন এক লোহার দেবীমূর্তি এক কামারের কাছ থেকে হাটশেষে রাজা কিনলেন, কামার যখন রাজবাড়ির সামনে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল। রাজা সত্যপালনের জন্যে সেই লোহার দেবী কিনলেন এবং ঘরে আনলেন। লোহার মূর্তি ছিল অলক্ষ্মীর; লক্ষ্মী অমনি সেই রাত্রেই বিদায় হয়ে যান; রাজা বললেন, আমি সত্যপালন করেছি এতে দোষ কী? লক্ষ্মী রাজাকে বর দিলেন, তিনি পশুপক্ষীর কথা বুঝবেন কিন্তু লক্ষ্মী আর রাজ্যে রইলেন না। এমনি-এমনি প্রথমে রাজলক্ষ্মী তার পর ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, সবাই

১ Myths of Mexico and Peru, p. 85

একে-একে গেলেন ; তার পর ধর্ম আর কুললক্ষ্মী চললেন। রাজা ধর্মকে বললেন— কুললক্ষ্মী যেতে চান তো যান, কিন্তু ধর্ম, আপনি তো যেতে পারেন না, কেননা আমি সত্যধর্ম পালন করতেই এ কাজ করেছি। ধর্মরাজ বাড়িতেই রইলেন।

এর পরের কথাটুকুর মর্ম: রানী দেখেন রাজা পিঁপড়েদের দিকে চেয়ে একদিন ভোজনের সময় হেসে উঠলেন। পিঁপড়েগুলো রাজার পাতে খাবার সময় ঘি না দেখে, রাজাটা যে গরিব এই বলাবলি করছিল। রাজা হঠাৎ হাসলেন কেন, এই কথা রানী জানতে চাইলে, অনেক পেড়াপিড়িতে রাজা সম্মত হয়ে—কথাটা প্রকাশ করলে তাঁর মৃত্যু জেনেও—গঙ্গাতীরে রানীকে নিয়ে গিয়ে একটা ছাগল আর ছাগলির ঝগড়া শুনলেন। নদীর মধ্যে একবোঝা ঘাস দেখে ছাগলি সেটা চাচ্ছে আর ছাগল তাকে বলছে, আমি কি রাজার মতো বোকা যে তার কথায় প্রাণ হারাতে যাব। রাজা তখন রানীকে তাড়িয়ে দিলেন। তার পর রানী অনেক কষ্টে লক্ষ্মীপুজো ক'রে তবে রাজা রাজ্য সব ফিরিয়ে আনলেন। দুই ধর্ম, দুই দেবী, দুই দল মানুষে যে দুই পুজো নিয়ে একটা বেশ গোলযোগ চলেছিল এবং শেষে নতুন লক্ষ্মীই যে দেশের প্রাচীন লক্ষ্মীর পূজা দখল করেছিলেন এবং হাটে যে পূর্বকালে প্রাচীনা লক্ষ্মীমূর্তি বিক্রি হতে আসত এবং সেটি রাজা কিনে ধর্মলোপের ভয় করেন নি, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

মেয়েরা যে যে মাসে লক্ষ্মীব্রত করছে এবং অন্য দেশের লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে আমাদের পূজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে, লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান

শস্য উৎসব। কিন্তু পুজারিরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণন করে যে শ্লোকটি মেয়েদের শুনিয়ে দেন, সেটা থেকে কিছুতে বোঝা যাবে না যে এই ব্রত অফলন্ত, ফলন্ত এবং সুপক্ক শস্যের উৎসব-অনুষ্ঠান।

শাস্ত্রীয় শ্লোক বলছে—

লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়, যায় সর্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয়, নিত্য বাড়ে সুখ।

ধানের কি কোনো শস্যের নামগন্ধ এতে পাওয়া গেল না। প্রাচীন কালের প্রধান উৎসব এবং শস্য-দেবতারা খুবই প্রসিদ্ধ বলে এই ব্রতকে হিঁদুয়ানির চেহারা দেবার জন্য এর উপর এত জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে যে আসল ব্রতটি কেমন ছিল, তা আর এখন কতকটা কল্পনা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যে ব্রতগুলি ছোটো এবং অপ্রধান বলে শাস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অনেকটা অটুট অবস্থায় রয়ে গিয়েছে তার থেকে ব্রতের খাঁটি ও নিখুঁত চেহারাটি পাওয়া সহজ। যেমন এই 'তোষলা' ব্রতটি। কোথাও একে বলে 'তুঁষতুষলি'। পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দু-জায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে। প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই: অঘ্রানের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে, কালো দাগশূন্য নতুন সরাতে বেগুনপাতা

লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দূর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরসে শিম মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সারমাটি দিয়ে খেত উর্বর করে তোলার ব্রত। ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ববঙ্গে এক, পশ্চিমবঙ্গে আর-এক হলেও ছড়াগুলি পড়তে পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবনযাত্রার এমন একটি পরিষ্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না। পৌষমাসে এদেশে বেশ একটু শীত, এবং সকালবেলার ব্রত এটি, কাজেই আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি, বহুযুগ আগেকার বাংলাদেশের একখানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে সরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি শীতের হাওয়া বইছে—গ্রামের উপরে বড়ো গাছের আগায় এখনও কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো লেগে রয়েছে; শিশিরে সকালটি একটু ভিজে-ভিজে ; বেড়ার ধারে ধারে আর চালে চালে শিমপাতার সবুজ; খেতে খেতে মুলোর ফুল, সরসের ফুল—দুধ আর হলুদের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে, নতুন সরায় বেগুনপাতা চাপা দিয়ে, সারমাটি নিয়ে মেয়েরা দলে দলে তোষলা ব্রত করতে খেতের দিকে চলল এবং সেখানে মুলোর ফুল, শিমের ফুল, সরসের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হল।

প্রথম, তোষলার স্তুতি—

তুঁষ-তুঁষলি, তুমি কে।
তোমার পূজা করে যে—
ধনে ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত॥
তোষলা লো তুঁষকুন্তি!
ধনে ধানে গাঁয়ে গুস্তি,
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি॥

তার পর অনুষ্ঠান-উপকরণের বর্ণনা, যেমন—

গাইয়ের গোবর, সরষের ফুল,
আসনপিঁড়ি, এলোচুল,
গেয়ের গোবরে সরষের ফুল,
ঐ ক'রে পূজি আমরা মা-বাপের কুল।

'আসনপিঁড়ি, এলোচুল'। এখানে আমরা সেই মেক্সিকোর মেয়েদের এলোচুলে ব্রত করার প্রতিচ্ছবিটি পাচ্ছি। এর পরে মেয়েরা তোষলা ব্রতের কামনা জানাচ্ছে—

কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব,
সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।
ঘর করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

তারপর পৌষের সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রত সাঙ্গ করে একটি সরায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে সেগুলি মাথায় নিয়ে সারি বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষলা ভাসাতে চলেছে। পায়ের তলায় মাটি ঠাণ্ডা; হিম বাতাস নদীর শীতল জলের পরশ পেয়ে কনকনে বইছে। এই শীতের জল-স্থল-আকাশের প্রতিধ্বনি দিচ্ছে মেয়েরা নদীতে যাবার পথে—

কুলকুলনি এয়ো রানী,
মাঘ মাসে শীতল পানি,

শীতল শীতল ধাইলো,
বড়ো গঙ্গা নাইলো।

এর পর নিথর শীতের মধ্যে সূর্যের ও পৃথিবীর মিলনের একটু আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগল—

শীতল শীতল জাগে,
রাই বিয়ে মাগে।

এর পর গঙ্গাতীরে জলের কলধ্বনি, পাখিদের কাকলির সঙ্গে সূর্যের বর-যাত্রার বাদ্য বাজছে—

আমাদের রায়ের বিয়ে
ঝাম্-কুর্-কুর্ দিয়ে।

তখনও রাত্রের শিশিরে-ভেজা শাকসবজির পাতাগুলি ঘুমিয়ে রয়েছে; সেই সময় বরবেশে সূর্য আসছেন; তারই সূচনা একটু ঝিকৃমিকে সোনার আলো।

বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা,
রায়ের কানে সোনার তোলা।

এইখানে নদীতে তোষলার সরা ভাসিয়ে, তোষলার সারমাটি আর সূর্য, চাষের দুই প্রধান সহায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়েদের জলে ঝাঁপাঝাঁপি বালিখেলা—

তোষলা গো রাঈ, তোমার দৌলতে আমরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই,
ছ-বুড়ি ন-বুড়ি, গাঙ্ সিনানে যাই, গাঙের বালিগুলি দুহাতে মোড়াই;
গাঙের ভিতর লাড়ুকলা ডব্ ডবাতে খাই।
তুষলি গো রাঈ, তুষলি গো ভাই,
তোমার ব্রতে কিবা পাই?
ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা গুলি খাই,
তোমাকে নিয়ে জলে যাই,
তুষ-তুষ্‌লি গেল ভেসে, বাপ-মার ধন এল হেসে,
তুষ-তুষ্‌লি গেল ভেসে, আমার সোয়ামির ধন এল হেসে।

এর পর, সূর্যের উদয় দর্শন করে, স্নান করে, ব্রতশেষে নদীতীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় বর্ণন করে ছড়া—

রায় উঠছেন রায় উঠছেন বড়ো-গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে তেল-গামছা ? দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠছেন রায় উঠছেন মেজো-গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতে রে শাখা সিঁদুর দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠছেন রায় উঠছেন ছোটো-গঙ্গার ঘাটে।
রায় উঠছেন অগ্নে, তামার হাঁড়ির বর্ণে,
তামার হাঁড়ি, তামার বেড়ি—

এর শেষটুকুতে হিঁদুয়ানি আপনার নাম দস্তখত করে এক আঁচড় দিয়েছে—'উঠ উঠ মা-গৌরী নিবেদন করি'। হঠাৎ মা-গৌরী এসে কেন যে বেড়ি ধরেন তা বোঝা গেল না। ঝক্‌ঝকে আয়নার উপরে পেরেকের আঁচড়ের মতো এই শেষ লাইনটা; বা যেন মিশনারি-স্কুলে-পড়া মেয়ের মুখে—'বড়ো মেম নমস্কার'—খাপছাড়া, শ্রুতিকটু, অর্থহীন। এর পরে মেয়েরা ঘরে এসে পোষমাসের পিঠে খাবার আয়োজন করে যে ছড়া বলছে—সেটাও এ-লাইনটার চেয়ে সহজ আর সুন্দর।—

আখা জলন্তি, পাখা চলন্তি,
চন্দন-কাষ্ঠে রন্ধনঘরে,
জিরার আগে তুষ পোড়ে,
খড়িকার আগে ভোজন করে,
প্রাণ স্বচ্ছন্দে নতুন বসৃতে
কাল কাটাব মোরা জন্মায়ন্তে।

তোষলা ব্রতের অনুষ্ঠান, এই শীতের প্রভাতের দৃশ্যপটগুলি, আর সদ্যঃস্নাত মেয়েদের মুখে সিন্দূর এবং মার্জিত তামার বর্ণ রক্তবাস সূর্যের উজ্জ্বল বর্ণনা—আমাদের সহজেই সেইকালের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে দেখি মানুষে আর বিশ্বচরাচরের মধ্যে সরস একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে; গড়াপেটা শাস্ত্রীয়

ব্রতের এবং হিন্দুয়ানির আচার-অনুষ্ঠানের চাপনে মানুষের মন যেখানে সব দিক দিয়ে অনুর্বর, নিরানন্দ এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ে নি। এই তোষলা ব্রতের জীবন্ত দৃশ্যকাব্যটির সঙ্গে ছোটো একটি শাস্ত্রীয় ব্রত মিলিয়ে দুয়ের মধ্যে কী নিয়ে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট ধরা পড়বে। হরিচরণ ব্রত—বছরের প্রথম মাসে, খুব ছোটো মেয়েরা এই ব্রত করছে চন্দন দিয়ে তামার টাটে হরিপাদপদ্ম লিখে। কিন্তু এই ব্রতে ছোটো মেয়ের মুখের কথা বা প্রাণের আনন্দ, এমন-কী ছোটো খাটো আশাটুকু পর্যন্ত নেই। পাকা-পাকা কথা এবং জ্যাঠামিতে ভরা এই শাস্ত্রীয় ব্রতটি অত্যন্ত নীরস। হরির পাদপদ্মে পুজো দিয়ে পাঁচ-ছয় বছরের ছোটো মেয়েগুলি বর চাইছে—গিরিরাজ বাপ, মেনকার মতো মা, রাজা সোয়ামি, সভা-উজ্জল জামাই, গুণবতী বউ, রূপবতী ঝি, লক্ষ্মণ দেবর, দুর্গার আদর—'দাস চান, দাসী চান, রুপার খাটে পা মেলতে চান, সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান, বছর-বছর পুত্র চান।' আর চান—'পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে একগলা গঙ্গাজলে মরণ, এবং 'উযোতে পারলে ইন্দ্রের শচীপনা, না পারলে কৃষ্ণের দাসীগিরি'!

হরিচরণ ব্রত করছে এই যে মেয়েগুলি বৈশাখের সকালবেলায়, আর শীতের সকালে শীর্ণধারা নদীতীরে, তোষলা ব্রতের দিনে, সরষে শিম এমনি নানা ফুলে সাজানো সরা ভাসিয়ে, স্রোতের জলে নেমে, সূর্যের উদয়কে এবং শস্যের উদ্গমকে কামনা করছে যে মেয়েগুলি—এই দুই দলে কী বিষম পার্থক্য, দুই অনুষ্ঠানেই বা কী না তফাত। একদল একগলা গঙ্গাজলে আত্মহত্যায় উদ্যত; অন্যদল বিশ্বচরাচরের সঙ্গে সূর্যের আলোতে হলুদ, আর সাদা ফুলে-ফুলে-ভরা খেতের মতো জেগে ওঠবার জন্যে আনন্দে উদ্‌গ্রীব।

প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই-সব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্যরকম সৌন্দর্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধর্মানুষ্ঠান বলব কি ষড়্‌ঋতুর এক-একটি উৎসব বলব ঠিক করা শক্ত। চৈত্রের এই অশত্থপাতার ব্রত—যার সমস্ত অনুষ্ঠানের অর্থ হচ্ছে কিশলয় থেকে

ঝরে-পড়া পর্যন্ত কচি কাঁচা পাকা এবং শুকনো পাতার একটুখানি ইতিহাস, তাকে কী বলব!

বসন্তের বাতাস লেগে গত শীতের শুকনো পাতা গাছের তলায় ঝরে পড়েছে; নদীর ধারে অশথ, কুঞ্জলতা, চাঁপাস্থন্দরী আর শ্যাম পণ্ডিতের ঝি— কেউ পাকা পাতার তামাটে লাল, কেউ কাঁচা পাতার সতেজ সোনালী সবুজ, কেউ কচি পাতার কোমল শ্যাম, কেউ শুকনো পাতার তপ্ত সোনা, কেউ বা ঝরা পাতার পাণ্ডুর রঙে সেজেছে। অশথপাতা, কুঞ্জলতা, চমকাস্থন্দরী; আর এই তিন বনস্থন্দরীর সঙ্গে সেজেগুজে ব্রত করতে বেরিয়েছেন শ্যাম পণ্ডিতের ঝি। শ্যাম পণ্ডিতের সাত-সাত বউ, জোয়ান সাত বেটা, পণ্ডিতের গিন্নি, আর বুড়ো পণ্ডিত নিজে—ছোটো-বড়ো আরো-বড়ো একেবারে বুড়ো— কচি মেয়েটি, কাঁচা বয়সের বউ-বেটা, পাকা গিন্নি আর বিষম শুকনো কর্তা।

অশথপাতা কুঞ্জলতা চমকাস্থন্দরী!
গঙ্গাস্নান করতে গেলেন শ্যামপণ্ডিতের ঝি;
সাত বউ যায় সাত দোলায়, সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়,
কর্তা যান গজহস্তীতে, গিন্নি যান রত্নসিংহাসনে,
ঠাকুর ঠাকরুন দোলনে যান।

এই ছড়াটি পরিষ্কার বোঝাচ্ছে, বসন্তের দিনে নদীর ধারে চাঁপা কুঞ্জলতা অশথ এদের একটা উৎসব চলেছে— সবুজে পাণ্ডাশে নতুন ফুটে-ওঠা থেকে আস্তে ঝরে পড়ায়; দলে দলে বুড়োবুড়ি ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী এই-সব উৎসব দেখতে আসছে— কেউ হেলতে দুলতে, কেউ নাচতে নাচতে, কেউ বা গজেন্দ্রগমনে। এর পরেই ঠাকুর ঠাকরুন। এঁরা যে কোন্ দেবতা তা বলা যায় না— শিব-দুর্গা হতে পারেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন, পিতৃপুরুষদেরও কেউ হতে পারেন। এঁদের দুজনে কথা হচ্ছে—

ঠাকুর জিজ্ঞাসেন। ঠাকরুন! নরলোকে গঙ্গার ঘাটে কী ব্রত করে?
উত্তর। অশথপাতার ব্রত করে।
প্রশ্ন। এ ব্রত করলে কী হয়?

উত্তর। সুখ হয়, সহায় হয়, সোয়াস্তি হয়।

এর পর ঠাকুর দেখলেন ছেলেবুড়ো সবাই মিলে একটি করে পাতা মাথায় রাখছে আর জলে ডুব দিচ্ছে আর পাতাগুলি জলের স্রোতে ভেসে চলেছে। ঠাকুর ভেবে পান না মানুষরা সব করে কী? এই বসন্তকালে, লোকে এ কী পাগলামি করতে লাগল! তখন ঠাকরুন তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করে বলছেন, এরা গাছে আর মানুষে মিলে এক-এক পাতার কামনা জানিয়ে ব্রত করছে।

এরা—পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুকনো পাতাটি মাথায় দিয়ে সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে মণিমুক্তোর ঝুরি পরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে কোলে কমল পুত্র ধরে।

এই ব্রতটিতে বসন্তদিনে মানুষে আর গাছপালায় মিলিয়ে একটুখানি রূপক—ছোটো একটু নাটকের মতো করে গাঁথা হয়েছে ছাড়া আর কী বলা যাবে? এই তো একটুখানি ব্রত, কিন্তু তবু এর মধ্যে বসন্তের দিনে নতুন এবং পুরনোর, মানুষের এবং বনের নিশ্বাসটুকু যখন এক তালে উঠছে পড়ছে দেখি তখন এটিকে ছোটো বলতে ইচ্ছা হয় না; এইটুকুর মধ্যে কতখানির ইঙ্গিত, কতখানি রস না পাচ্ছি!

খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়; এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া। মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।

'আদর-সিংহাসন' ব্রতে মানুষ আদর চেয়ে মিষ্টি কথা পাবার কামনা ক'রে তো শাস্ত্রীয় হরিচরণ-ব্রতের মতো তামার টাটে দেবতার পাদপদ্ম লিখে

পূজা ক'রে বরপ্রার্থনা করছে না। সে যে-আদরটি কামনা করছে সেটি একটি জীবন্ত প্রতিমার মধ্যে ধরে দেখবার আয়োজন করছে। সত্যি এক স্বামী-সোহাগিনীকে সামনে বসিয়ে বসনভূষণে সাজিয়ে যেমন আদর সে নিজে কামনা করছে তেমনি আদর তার মূর্তিমতী কামনাকে অর্পণ করছে এবং জানছে যে এতেই তার আদর পাওয়ার কামনা চরিতার্থ হবে নিশ্চয়। এইখানে ব্রত আর পুজোতে তফাত।

মেয়েলি ব্রতগুলির সব-কটি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। কালে কালে তাদের এত ভাঙচুর অদলবদল উলটোপালটা হয়ে গেছে যে, কোন্‌টা পুজো কোন্‌টা ব্রত ধরতে হলে আদর্শ ব্রতের লক্ষণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে গোলে পড়তে হয়। খাঁটি ব্রতের লক্ষণ মোটামুটি এই বলে নির্দেশ করা যেতে পারে: প্রথমত, খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই; দ্বিতীয়ত, ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার।

কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া যখন একেরই মধ্যে কিংবা অসংহতভাবে দশের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবস্থায় রইল তখন সেই একেরই সঙ্গে বা একে-একে দশের সঙ্গে তার লোপ হয়ে গেল। কিন্তু এক ভাব এক ক্রিয়া যখন সমস্ত জাতিকে প্রেরণা দিলে তখন সেটি ব্রত হল, এবং বেঁচেও রইল দেখি।

আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার ক'রে গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলি ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের—তখনকার, যখন শাস্ত্র হয় নি, হিন্দুধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান, যেগুলির নাম ব্রত।

এই-সব ব্রতের মূলে কীসের প্রেরণা রয়েছে, বলা শক্ত। মানুষের ধর্ম প্রবৃত্তি না মানুষের শিল্পসৃষ্টির বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে এই ব্রতগুলি, সেটা পরিষ্কার করে দেখার পূর্বে ব্রতগুলির সঙ্গে পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া দরকার।

প্রথমে দেখি, কতকগুলি ব্রত যাতে কামনা এবং আলপনা ও ছড়া একটি অন্যকে অনুকরণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন, কামনা হল সোনার চিরুনি, সোনার কৌটো, আয়না, পালকি। সেখানে পিটুলির আলপনা দিয়ে একটা চিরুনি, একটা কৌটো, পালকি একটা, আয়না একটা আঁকা হল এবং তাতে ফুল ধরে ধরে বলা হল—

আমরা পূজা করি পিঠালির চিরুনি,
আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।
আমরা পূজা করি পিঠালির কুটুই,
আমাগো হয় যেন সোনার কুটুই।
আমরা পূজা করি পিঠালির পালকি,
আমাগো হয় যেন সোনার পালকি।

এখানে, চিরুনি-দেবতা কৌটো দেবতা পালকি-দেবতা ইত্যাদিকে পূজা করে বর চাওয়া। একেবারে কাজের কথা, এবং যতটুকু কাজের কেবল ততটুকু, একটু বাজে কিছু নেই। যা চাই তারই অনুরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কল্পনা করে বরপ্রার্থনা।

আর-এক রকম, তাতে কামনার অনুরূপ ছড়া, কিন্তু আলপনাটি ভিন্নরূপ। মাদার গাছ এঁকে বলা হচ্ছে—

আমরা পূজা করি চিত্রের মান্দার,
আমাগো হয় যেন ধান চাউলের ভাণ্ডার।
আমরা পূজা করি পিঠালির মান্দার,
সোনায় রূপায় আমাগো ঘর আন্ধার।

মাদারগাছে সঙ্গে ধানচাল সোনা-রূপোর পরিষ্কার যোগ নেই অথচ

তাতে ফুল দিয়ে বর চাওয়া হল এবং এখানেও কাজের জন্য যতটুকু ততটুকু হল আলপনা, এবং ততটুকু হল ছড়া। গদ্যসাহিত্য আধুনিক, সুতরাং কথায় এখন যা বলি, পূর্বে যখন পদ্যই সাহিত্যের ভাষা তখন ছড়াগুলি পদ্যেই বলা হত। কিন্তু এই ধরনের ছড়াকে কবিতা কিংবা গান কি নাটক কিছুই বলা যায় না। এরা কেবল পদ্যে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করছে, এই মাত্র। 'জল দে বাবা' না বলে বলছি 'দে জল, দে জল বাবা!' এতে জল আছে স্পষ্ট বোঝাল কিন্তু কাব্যরস তো নেই। এই ধরনের ছড়া কিংবা এই ছাঁচের ব্রতগুলিতে পদ্য, আলপনা ও নানা চলাবলা থাকলেও এগুলিকে কোনোদিন চিত্রকলা কি কাব্য বা নাট্য-কলা বলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু পরে যে দু-একটি ব্রতের ছড়া প্রকাশ করছি সেগুলির গঠনের এবং বাঁধুনির প্রণালী দেখলেই বোঝা যাবে তার মধ্যে নাট্যকলার লক্ষণ কেমন পরিস্ফুট।

আলপনার অংশটাকে দৃশ্যপটের হিসাবে নিয়ে, ছড়া ও ক্রিয়া থেকে ভাদুলি ব্রতের অনুষ্ঠানের যে মূর্তিটি পাওয়া যায় তা এই—

ক্রিয়া আরম্ভ হল। ভাদ্র মাসের ভরা নদী, কলসি-কাঁখে জল তুলতে চলেছে একটি ছোটো মেয়ে এবং তার চেয়ে একটুও বড়ো নয় এমন একটি ঘোমটা-দেওয়া নতুন বউ এবং সঙ্গিনীগণ।

জল তোলার গান বা ছড়া

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
ভাদুলিঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ।
এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিনকুলে সুখ।

একে একে নদীর জলে ফুল দিয়া

ছোটো মেয়ে। নদী, নদী, কোথায় যাও?
বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।
ছোটো বউ। নদী, নদী, কোথায় যাও।
সোয়ামি-শ্বশুরের বার্তা দাও।

ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি এল ; সকলে জলে-স্থলে ফুল ছিটাইয়া :

নদীর জল, বৃষ্টির জল, যে জল হও,
আমার বাপ-ভায়ের সম্বাদ কও।

বৃষ্টির শেষে, মেঘে-কালো আকাশ দিয়ে একঝাঁক সাদা বক উড়তে উড়তে চলে গেল ; একদল কাক কা-কা করতে করতে বড়ো একটা বকুলগাছ ছেড়ে গ্রামের দিকে উড়ে পালাল ; আকাশ একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

মেয়ে। কাগা রে ! বগা রে ! কার কপালে খাও ?
আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে, কোথায় দেখলে নাও ?

মেঘ-ফাটা রৌদ্র ভরা নদীর বুকে বালুচরের একটু মরীচিকার মতো ঝিকমিক করেই মিলিয়ে গেল।

মেয়ে। চড়া ! চড়া ! চেয়ে থেকো,
আমার বাপ-ভাইকে দেখে হেসো।

কোন্ গ্রামের একটা দড়ি-ছেঁড়া ভেলা স্রোতের টানে হু হু করে বেরিয়ে গেল।

মেয়ে। ভেলা ! ভেলা ! সমুদ্রে থেকো,
আমার বাপ-ভাইকে মনে রেখো !

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রতক্রিয়ার দ্বিতীয় পালা বা দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হল ; বনজঙ্গলে ঘেরা কাঁটা-পর্বত, অন্ধকার রাত্রি, দূরে নানা জন্তু ও সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

মেয়ে সভয়ে। বনের বাঘ ! বনের মোষ !
তোমরা নিও না আমার বাপ-ভায়ের দোষ।

সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে। বাপ-ভাই গেছেন কোন্ ব্রজে ?
সোয়ামি-শ্বশুর গেছেন কোন্ ব্রজে ?

বনদেবী আশ্বাস দিয়া। তাঁরা গেছেন এক পথে,
ফিরে আসবেন আর পথে।

উদয়গিরিশিখরে সূর্যোদয়ের আভা লাগল ; উদয়গিরিকে ফুল দিয়ে পুজো করে সকলে। কাঁটার পর্বত ! সোনার চূড়া ! উদয়গিরি !

তোমারে যে পূজলাম সুমঙ্গলে, আসুন তাঁরা আপন বাড়ি।

বনদেবীর প্রতি সকলে। তোমার হোক সোনার পিঁড়ি।

সূর্যোদয়ের আলোর মধ্যে জোড়া ছত্র মাথায়, দিনরাত্রি শরৎ-বর্ষার দুই নৌকোয় পা রেখে, সমুদ্রের উপরে ভাদুলির আবির্ভাব।

সাগরের গান। সাত-সমুদ্রে বাতাস খেলে, কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে !

বনদেবী সাগরের প্রতি। সাগর ! সাগর ! বন্দি।

মেয়ে। তোমার সঙ্গে সন্ধি।

সাগরকে ঘিরিয়া সকলে। ভাই গেছেন বাণিজ্যে,
বাপ গেছেন বাণিজ্যে,
সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে।

আকাশবাণী। ফিরে আসবেন আজ,
ফিরে আসবেন আজ,
ফিরে আসবেন আজ।

সকলের নমস্কার। জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর জোড়নৌকায় পা।
আসতে-যেতে কুশল করবেন ভাদুলি মা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যে ভাদুলি-অনুষ্ঠানের তৃতীয় দৃশ্য বা পালা শুরু হল ; ভাদ্রের শেষদিন, নতুন শরতের সকাল ঘুমন্ত গ্রামখানির উপরে এসে পড়েছে, মেয়েদের খিড়কির পুকুর কানায় কানায় পরিপূর্ণ, তারই উপরে সোনার রোদ ঝিকমিক করছে, পুকুরে পাড়ে জোড়া তালগাছ। তাতে বাবুইপাখির বাসা। বাবুইপাখি গাইছে।—

পুঁটি ! পুঁটি ! উঠে চা।
ভাদুলি মায়ে বর দিল।
ঘাটে এল সপ্ত না'।

কুটিরের ঝাঁপ খুলে নৌকো-বরণের ডালা হাতে সব মেয়ে-বউ একে একে বাহির হচ্ছে।

বুড়ি পড়শি। পড়শি লো পড়শি!—
ভাল-ভাল পরমায়ু, তালের আগে চোক!
ঘাটে এসে ডঙ্কা দেয় কোন্ বাড়ির নোক!

মেয়েরা, বউরা। আমার বাড়ির নোক, আমার বাড়ির নোক!

দূরে ডঙ্কা পড়লে একদল বাবুই কিচমিচ করে বাসা ছেড়ে উড়ল।—

মেয়েয়া সকলে। বাবুই-বাসা দল দল!
নৌকা ব'রতে ঘাটে চল্, ঘাটে চল্। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সকালবেলার নদীতীরে ভাদুলির পালা সাঙ্গ হচ্ছে; গঙ্গার অনেক দুরে দুরে ঘরমুখো নৌকো, সাদা সাদা পালগুলি দেখা দিয়েছে। কতকগুলি নৌকো পরের পর এসে ঘাটে লাগল, যাত্রী ওঠানামার, নৌকো ভেড়াবার কোলাহল; প্রবাসীরা সব পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ডাঙায় নামছে।

মেয়েরা নৌকোবরণ ক'রে

এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে চন্দন দিলাম,
বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম।
এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিন্দূর দিলাম,
বাপ ভায়ের দর্শন পেলাম।

বউরা জলে কলাবউ ও ফুল ইত্যাদি ভাসাইয়া

কলার কাঁদি! কলার কাঁদি!
তোমাকে দিলাম গঙ্গায়, আমরা গিয়া রাঁধি।

যাত্রী ও নাবিকদলের গান

একূল ওকূল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।

এক নৌকা চড়ায় লাগালাম,
এক নৌকা ছাড়লাম।
ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই, সকল নৌকা পেলাম।
সুতো ধরিয়া সকলকে ঘিরিয়া মেয়েরা
দিক্ দিক্ সকল দিক্ সকল দিকেই বামুন।
ব্রজে হোক বাণিজ্যে হোক দেবতায় বেঁধে রাখুন।

গায়ে নামাবলী কোশাকুশি হাতে গ্রামের আচার্যির প্রবেশ

আচার্যি। নম নম ভাদুলিদেবী ইন্দ্রের শাশুড়ি,
বছর বছর রক্ষা কোরো ব্রতীর পুরী।

যার যে কথাটি এবং ক্রিয়াটি কেবল সেইটুকু নির্দিষ্ট করা এবং প্রত্যেক দৃশ্যের গোড়ায় যা-যা আলপনা দেওয়া হয় সেইগুলি একটু বর্ণনা করে দেওয়া ছাড়া, ছড়াগুলির সংস্থানে আমি কিছুমাত্র উলটোপালটা করি নি; অথচ কেমন সহজে আপনি এর নাট্য-অংশটা বেরিয়ে এল। এই ব্রতের প্রত্যেক ছড়া, ঘটনা-স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে আপনিই এক-এক অঙ্কে ভাগ হয়ে রয়েছে দেখি। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘরের লোকরা সন্ধান করছে, যারা বাইরে গেছে তাদের নিরাপদে দেশে আসার প্রতীক্ষা করছে, কামনা করছে। এটি প্রতীক্ষা ও বিরহের অঙ্ক। তৃতীয় চতুর্থ দৃশ্য হল মিলনের; নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ছে, পথে ঘাটে আনন্দ। এটাকে একটা মহানাটক বলা চলে না, কিন্তু নাট্যকলার অঙ্কুর যে এখানে দেখছি সেটা নিশ্চয়।

ছেলেভুলোনো ছড়া একটিমাত্র ভাব দৃশ্য বা ঘটনা নিয়ে যেমন ক'রে সেটাকে বর্ণন করে, ভাদুলিব্রতের ছড়াগুলি তো জিনিসটাকে আমাদের সামনে তেমন ক'রে উপস্থিত করছে না! ছেলেভুলোনো ছড়া, যেমন—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি এসো,
সেঁজ নেই, মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বসো।
ডিবে ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো,
খিড়কি-দুয়োর খুলে দেব, ফুড়ুত করে যেয়ো।

কিম্বা যেমন—ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি
চামকাটা মজুমদার,
ধেয়ে এল দামুদার,
দামুদার ছুতোরের পো,
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।

এগুলোর মধ্যে ওঠাবসা, চলাফেরা, মাসি, পিসি, মজুমদার, দামুদার, ছুতোরের পো—এমনি নানা ঘটনা, নানা পাত্রপাত্রী যথেষ্ট রয়েছে ; কিন্তু এদের নিয়ে অভিনয় বা নাটক করা চলে না। কিন্তু ভাদুলির অনুষ্ঠান গাছপালার মধ্যে, নয় তো স্টেজে সিন খাটিয়ে একদিন লোককে দেখিয়ে দেওয়া চলে।

ভাদুলিব্রতের মতো আরও ব্রত রয়েছে যার ছড়াগুলি আলাদা আলাদা টুকরো টুকরো জিনিস নয়, কিন্তু সমগ্র পদার্থ, পুরো একটি নাটিকা—যদিও খুব ছোটো !—ছবি ও ছড়া আঁকায় ও অভিনয়ে একটুখানি। এই-সব ছড়ায় নানা রসের সমাবেশ দেখা যায়, শুধু কামনাটুকু জানানো এই-সব ছড়ার উদ্দেশ্যও নয়। দুই রকমের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। একশ্রেণীর ছড়া কামনাকে স্বর দিচ্ছে, সুর দিচ্ছে না, কিংবা মনের আবেগের অনুরণনও তার মধ্যে নেই। এই ভাবের ছড়া দিয়ে মেয়েদের এই সেঁজুতি ব্রতটি গাঁথা হয়েছে। সেঁজুতি খুব একটি বড়ো ব্রত। "সকল ব্রত করলেন ধনী, বাকি রইল সাঁজ-সুঁজনী।" এই ব্রতটিতে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিস আলপনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধ'রে, এক-একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টুকরো-টুকরো। কেবল কামনা জানানো ছাড়া আর কিছু পাই নে, যেমন—

সাঁজপূজন সেঁজুতি
ষোলো ঘরে ষোলো ব্রতী ;
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর—
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর।

দোলার ফুল ধ'রে
বাপের বাড়ির দোলাখানি
শ্বশুরবাড়ি যায়।
আসতে-যেতে দুই জনে
ঘৃত মধু খায়।

বেগুনপাতায় ফুল ধরে

বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা
মার কোলে সোনার তোলা

প্রত্যেক জিনিসে ফুল ধরে

মাকড়সা, মাকড়সা, চিত্রের কৌটা!
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা!
গুয়ো গাছ! কাঁকুনি গাছ!
মুঠে ধরি মাজা।
বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর,
ভাই হয়েছেন রাজা।
শর, শর, শর!
আমার ভাই গাঁয়ের বর।
বেণা, বেণা, বেণা!
আমার ভাই চাঁদের কোণা।
আম-কাঁঠালের পিঁড়িখানি
তেল-কুচকুচ করে,
আমার ভাই অমুক যে
সেই বসতে পারে।
বাঁশের কোঁড়া! শালের কোঁড়া!
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি,
আমি যেন হই রাজার ঝি।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি মউ,
আমি যেন হই রাজার বউ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি,
আমি যেন হই রাজার রানি।
কুলগাছ, কুলগাছ, কেঁকুড়ি।
সতিন বেটি মেকুড়ি।
ময়না, ময়না ময়না!
সতিন যেন হয় না।
হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতিনের মাথা।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি!
সতিন মাগি টেরি!
পাখি, পাখি, পাখি!
সতিন মাগি মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি।
বঁটি, বঁটি, বঁটি!
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।
অসৎ কেটে বসত করি,
সতিন কেটে আলতা পরি।
চড়া রে, চড়ি রে, এবার বড়ো বান,
উঁচু করে বাঁধব মাচা,
বসে দেখব ধান।
ওই আসছে টাকার ছালা,
তাই গুণতে গেল বেলা।
ওই আসছে ধানের ছালা,
তাই মাপতে গেল বেলা।
কেন রে নাতি, এত রাত্তি?
কাদায় পড়িল ছাতি,
তাই তুলতে এত রাত্তি?
এসো নাতি, বসো খাটে,

পা ধোওগে গড়ের মাঠে।
সোনার ভেঁটা দেন হাতে,
খেল্ করবে পথে পথে।
গঙ্গা-যমুনা জুড়ি হয়ে,
সাত-ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রীসমান হয়ে,
গঙ্গাযমুনা পূজ্যন্
সোনার থালে ভুজ্যন্।
চন্দ্রসূর্য পূজ্যন্,
সোনার থালে ভুজ্যন্।
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু,
শঙ্খের উপর স্থবর্ণের খাড়ু।
অরুণঠাকুর বরণে
ফুল ফুটেছে চরণে।
যখন ঠাকুর বর দেন,
আপনার ফুল কুড়িয়ে নেন। ইত্যাদি

এইবার মাঘমণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি। পৌষের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয়ে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত ব্রত চলে। এই ব্রতের ছড়া দেখি তিন অঙ্কে ভাগ করা রয়েছে। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্যের উদয় বা শীতের পরাজয় ও সূর্যের অভ্যুদয়। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে, শেষ অংশে বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তাঁর পরিণয়। প্রথম দৃশ্যপট উঠল—

প্রথম দৃশ্য

শীতের শেষরাত্রি, কুয়াশা তখনো ঘন হয়ে চারি দিক ঢেকে রয়েছে, রাত্রের ফুলদুটি শিশিরের ভারে একেবারে জলের ধারে ঝুঁকে পড়েছে, একটুখানি বাতাসে ঘাসের শীষগুলি দুলে দুলে সেই ফুলদুটির সঙ্গে দিঘির জল থেকে-থেকে স্পর্শ করতে লেগেছে। মালীর বাগানে ছোটো ছোটো ফুলবালারা আর গ্রামের ব্রতীরা পুকুরের পাড়ে সব পা মেলে ফুলের আগায় পুকুরের জল নিয়ে খেলা করতে লেগেছে।

ফুলবালারা। চোখে-মুখে জল দিতে কী কী ফুল লাগে?

ফুলেরা। ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে।

দিঘির ওপার থেকে নাগেশ্বরের মন্দিরের মালি প্রশ্ন করছে, 'ওপার থেকে জিজ্ঞাসেন মালী'—বলি, কী কী ফুলে মুখ পাখালি?

ফুলেরা। ইতল বেতল দুই ফুলে।
সরুয়া মরুয়া দুই ফুলে।
মালি। সেই ফুলে খান কি?
ফুল। নল ভেঙে জল খান।

ফুলবালারা, ফুলেরা, ঘাসেরা, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে—

যে জল ছোঁয় না লো কাকে বগে,
সে জল ছুঁই মোরা দূর্বার আগে!

ব্রতীরা, ফুলবালারা, ফুলেরা সকলে আছোঁয়া পুকুরের পরিষ্কার জল মুখে-চোখে দিচ্ছে; সাজি হাতে মালিনীর প্রবেশ এবং এই কাণ্ড দেখে মালিনীর রঙ্গভঙ্গ ও উচ্চহাস্য।

ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মেলেনিটা খটখটাইয়া হাসে।

হেসে যে মালিনী কী বলছে তা পরের উত্তর-প্রত্যুত্তর থেকে বেশ এঁচে নেয়া যায়। মালিনী বলছে যেন—একি? একি? আজ যে বড়ো 'ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে'। ওমা এই শীতের রাত না পোহাতে গেরস্তর মেয়ে তোমরা এই আঘাটায় কেন গো?

মেয়েরা। হাসিস না লো, খুশিস না লো, তুই তো আমার সই!
মাঘমণ্ডলের বর্ত করুম্, ঘাট পামু কই?
মালিনী। আছে আছে লো ঘাট, বামুনবাড়ির ঘাট!
মেয়েরা। রাত পোহালে বামুনগো পৈতে ধোওনের ঠাট।

সেখানে আমরা যাব না মালিনী, জল ভালো নয়—'পৈতা-কচলানো জল পুকুরেতে ভাসে'।

মালিনী। আছে আছে লো ঘাট, গোয়ালবাড়ির ঘাট!
মেয়েরা। গয়লাগো দই-ক্ষীরের হাঁড়ি ধোওনের ঠাট।
মালিনী। নাপিতবাড়ির ঘাট?
মেয়েরা। নাপিতগো খুর ধোওনের ঠাট।

মালিনী। ধোপাবাড়ির ঘাট ?

মেয়েরা। ধোপাগো কাপড় ধোওনের ঠাট।

মালিনী। ভুঁইমালির ঘাট ?

মেয়েরা। ভুঁইমালিগো কোদাল ধোওনের ঠাট।

মালিনী হাসিয়া। মেলেনি বুড়ির ঘাট ?

মেয়েরা। মেলেনি, বুড়ির ফুল ধোওনের ঠাট।

গান

মালি। আধাগাঙ্গে ঝড়বিষ্টি, আধাগাঙ্গে মালি,
মধ্যখানে পড়ে রয়েছে জৈৎ ফুলের ডালি।

মেয়েরা। কৈ যাস লো মালিনী ফুলের সাজি লৈয়া ?

মালিনী। ফুল ফুটেছে নানা রকম ডাল পড়েছে নুইয়া !

সকলে। আগের ফুল তুলিস না লো কলি-কলি !
গোড়ার ফুল তুলিস না লো বালি-বালি !

মালিনী। মধ্যের ফুল তুইলা আনিস নাগেশ্বরের মালি।
নাগেশ্বরের মালি রে !
কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি ?
কোন্ কোন্ ডালে খাইলি লইলি ?
কোন্ কোন্ ডালে নিশি পোহাইলি ?

মালি। জইতের ডালে রাঁধিলাম বাড়িলাম,
অত্তসীর ডালে খাইলাম লইলাম,
গাঁদার ডালে নিশি পোহাইলাম।

সকলে। জইত গাছে কে, ডাল নামাইয়া দে,
সূর্যি ঠাকুর চাইছেন ফুল, সাজি ভরিয়া দে।

এইখানে ফুল তোলার পালা সাঙ্গ হয়ে দ্বিতীয় পালা আরম্ভ হল, কুয়াশার মধ্যে একটি ফুলগাছের সামনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেয়েরা বেত্রলতা হাতে

কুয়া ভাঙ্গুম, কুয়া ভাঙ্গুম, বেৎলার আগে।
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে।
ওরে রে বরই গাছ, ঝুল্লন দে !
দে দে বরই রে, ঝুল্লন দে !

বেত্রলতার আগে জল ছিটাইয়া কুয়াশা ভাঙার অভিনয়

সকলে মিলিয়া তার পরে সূর্যের স্তব

মেয়েরা। উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
সূর্য। না উঠিতে পারি আমি ইয়লের[১] লাগিয়া।
মেয়েরা পরস্পরে ইয়লের পঞ্চকাটি শিয়রে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য কোন্‌খান দিয়া ?
মালিনী। উঠিবেন সূর্য বামুনবাড়ির ঘাটখান দিয়া।
মেয়েরা। উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
সূর্য। না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।
মেয়েরা। উঠিবেন সূর্য কোন্‌খান দিয়া ?
মালিনী। গোয়ালবাড়ির ঘাটখান দিয়া।

এমনি কত ঘাটেরই নাম হল, কিন্তু কোনো ঘাটেই সূর্য উদয় হলেন না। শেষে বুড়ি মালিনীর ঘাট, যেখানে ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসছে সেইখানে সূর্যোদয় হল কুয়াশা ভেঙে। এইবারে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ের পালা আরম্ভ হল।

প্রথম দৃশ্য

বাসরঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্য। কুঞ্জের মধ্যে সকাল হচ্ছে

চন্দ্রকলা সনিশ্বাসে। কাউয়ায় করে কল্‌মল্ ! কোকিলে করে ধ্বনি !
তোমার দেশে যাব সূর্য, মা বলিব কারে ?

১ কুয়াশার।

সূর্য। আমার মা তোমার শাশুড়ি, মা বলিয়ো তারে।
চন্দ্রকলা। তোমার দেশে যাব সূর্য, বাপ বলিব কারে?
সূর্য। আমার বাপ তোমার শ্বশুর, বাপ বলিয়ো তারে।
চন্দ্রকলা। তোমার দেশে যাব সূর্য, বইন বলিব কারে?
সূর্য। আমার বোন তোমার ননদ, বইন বলিয়ো তারে।
চন্দ্রকলা। তোমার দেশে যাব সূর্য, ভাই বলিব কারে?
সূর্য। আমার ভাই তোমার দেওর, ভাই বলিয়ো তারে।
চন্দ্রকলা সনিশ্বাসে। কাউয়ায় করে কল্‌মল্‌! কোকিলে করে ধ্বনি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সূর্যের বাড়ির সম্মুখ, বৈতালিকের গান

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ,
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ি,
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর ফিরেন বাড়ি-বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর বিয়া করতে চায়।

পড়শি। বিয়া করলেন সূর্যঠাকুর, দানে পাইলেন কী?
বৈতালিক। হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি।
খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন, আর মাধবের ঝি।
লেপ পাইলেন, তোশক পাইলেন,
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন,
থালা পাইলেন, খোরা পাইলেন, আর মাধবের ঝি।
পড়শি। মায়ের জন্য আনছেন কী?
বৈতালিক। শাঁখা সিঁদুর।
পড়শি! বাপের জন্য আনছেন কী?
বৈতালিক। হাতি ঘোড়া।

পড়শি। বইনের জন্য আনছেন কী ?

বৈতালিক। খেলানের সাজি।

গৌরী বা সন্ধ্যা, সূর্যের আগে স্ত্রীকে দেখিয়া চুপি চুপি

পড়শি। সতের জন্য আনছেন কী ?

বৈতালিক। কুঁইয়া পুঁটি।

গৌরী। থামু না লো থামু না লো, শিয়রে থুমু।
রাতখান পোহাইলে কাউয়ারে দিমু।

শাঁক বাজাইয়া, উলু দিয়া, কনে বরণের ডালা ইত্যাদি লইয়া
একদল মেয়ের প্রবেশ

মেয়েরা। উরু উরু দেখা যায় বড়ো বড়ো বাড়ি।
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি।

সূর্যের মার বাড়ির দরজায় গিয়া

সূর্যের মা[১] লো কি কর দুয়ারে বসিয়া ?
তোমার সূর্য আসতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।

সূর্যের মা। আসবেন সূর্য বসবেন খাটে,
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
গা হেলাবেন সোনার খাটে,
পা মেলাবেন রুপার পাটে,
ভাত খাইবেন সোনার থালে,
বেন্নন খাইবেন রুপার বাটিতে,
আঁচাইবেন ডাবর ভরা,
পান খাইবেন বিড়া বিড়া,
সুপারি খাইবেন ছড়া ছড়া,
খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা,

১ বেদে উষাকে সূর্যের মা বলা হইয়াছে।

চুন খাইবেন খুটুরি ভরা,
পিক ফেলাইবেন লাদা লাদা !

বরবেশে সূর্য চন্দ্রকলা-বধূকে লইয়া জাঁকজমকে আপনার পুরীতে প্রবেশ করলেন।

নট-নটীর নৃত্যগীত

নট। সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্যঠাকুর নাইতে গেলেন কৈলো।
নাইয়া ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈলো ॥

নটি। বাটি বাটি কুমার আটি, সকল পুড়িয়া গেল।
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল।

নট। গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই নিয়া।
আরেক বাটি গড়াম-নে চাকা সোনা দিয়া।

উভয়ে। সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্যের অন্তঃপুর। সূর্যের বাপ মা এবং ভাই ভগিনী খুড়ো খুড়ি ও ভাণ্ডারী সিকদার যে যার কাজে। কেউ শুয়ে, কেউ ব'সে। এদিকে ওদিকে বিয়ের দানসামগ্রী ছড়ানো। চন্দ্রকলার দেশ থেকে সবার জন্য উপহার এসেছে, কেবল সূর্যের বড়ো স্ত্রী গৌরী বা সন্ধ্যা কিছু না পেয়ে চোখ মুছতে মুছতে সূর্যের ধাইমার কাছে গিয়ে বাপের বাড়ি যাবার জন্য বলছেন।

গৌরী। আগা'টনি পানবাটনি ধাই-শাশুড়ি গো।
আমারে নি নাইয়র দিবা[১] ? আমারে নি নাইয়র দিবা ?

ধাই। কি জানি, কি জানি বউ গো,
জান গিয়া তোমার শ্বশুরের ঠাঁই।

১ নাইয়র দেওয়া—বাপের বাড়ি পাঠানো।

গৌরী। বাড়ির কর্তা শ্বশুরঠাকুর গো!

আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?

শ্বশুর। কি জানি, কি জানি বউ গো, জান গিয়া তোমার শাশুড়ির ঠাঁই।

গৌরী। বাড়ির গিন্নি শাশুড়ি-ঠাকুরানি গো, আমারে নি নাইয়র দিবা?

শাশুড়ি। কি জানি, জান ননাসের[১] ঠাঁই।

গৌরী। আনাজ-তরকারি-কুটনি ননাস-ঠাকুরানি গো—

ননাস। কি জানি, জান দেওরের ঠাঁই।

গৌরী। লেখইয়া পড়ইয়া দেওর গো—

দেওর। জান সিকদারের ঠাঁই।

গৌরী। আড়লের ভাঁড়লের কর্তা সিকদার হে—

সিকদার। (টাকে হাত বুলাইয়া) জান তোমার সোয়ামির ঠাঁই।

গৌরী। (সূর্যের কাছে গিয়া) ঘরগৃহস্থী সোয়ামি হে!

আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?

সূর্য রাগিয়া। আনিব চিকন চাটিলের চটা[২]

ভাঙিব গৌড়া নাইয়রের ঘটা!

এইখানে সূর্যের পুত্র লাউলের পালা আরম্ভ হল—'রাওল বা সূর্যপুত্র ঋতুরাজের বিয়ে'। রাতুল থেকেও লাউল কথাটি আসা সম্ভব।

প্রথম দৃশ্য

ঋতুরাজ রাওলের সঙ্গে মাটির কন্যা হালামালার বিয়ের আয়োজন চলছে। সকলে নানা আয়োজনে ব্যস্ত; সূর্যের বাপ হুঁকো-হাতে চালা বাঁধতে ব্যস্ত। বাঁশ দড়ি খড় ইত্যাদি চারি দিকে ছড়ানো। লোকজন ঘরামিরা কাজের একটু অবসরে হাঁড়ি বাজিয়ে গান ধরেছে:

গান

কাউয়া বলে কা,

রাত পোহাইয়া যা!

১ স্বামীর বড়ো বোন। ২ বাঁশের চটা।

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসির কাঁধা,
আজ লাউলের বড়ো বাড়ি বাঁধা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসির কাঁধা,
আজ লাউলের কলাবাগান বাঁধা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসির কাঁধা,
বড়ো বাড়ি বাঁধা।
কলাবাগান বাঁধা।
কাউয়া বলে কা,
রাত পোহাইয়া যা!

কাদামাটির ঝুড়ি মাথায়
একদল মালী-মালিনীর প্রবেশ

কাদামাটির তলে লো কাদামাটি,
তাতে ফেলাইলাম কাঁঠালখানি,
কাঁঠালের আগে লো তুলাখানি,
তাতে বসাইলাম বামুনহাটি।

ঘটক ব্রাহ্মণের প্রবেশ
ব্রাহ্মণকে হুঁকা দিয়া সূর্যের বাপ

বামুন ভাইয়া, বামুন ভাইয়া, ভাদুলা তামুক খাইয়ো।
আমার লাউলের বিয়ার সময়, ফুল মন্ত্র পড়িয়ো।

হাঁড়ি পাতিল লইয়া কুমোরের প্রবেশ

সূর্যের বাপ। কুমার ভাইয়া, কুমার ভাইয়া, ভাদুলা তামাক খাইয়ো।
আমার লাউলের বিয়ার সময় হাঁড়ি পাতিল দিয়ো।

ধোপা, নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ

সূর্যের বাপ। ভাদুলা তামুক খাইয়ো, ভায়া, ভাদুলা তামুক খাইয়ো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাউলের বিয়ের ভোজ। অন্দরবাড়িতে সূর্য ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন, গামছা মাথায়। জেলে সঙ্গে সিকদারের প্রবেশ।

সিকদার। সূর্য গো, পুকুরে ফেলাইলাম জাল, তাতে উঠিল না কিছু মাছ।

জেলেনিদের মাছ লইয়া প্রবেশ

জেলেনিরা। উঠল লো, উঠল মাছ।

সিকদার। নিবে কে?

জেলেনি। ওই আসছে বামুন মেয়ে খালুই হাতে ক'রে।

মেয়েরা খালুই ভরিয়া মাছ লইল

সিকদার। নিলাম লো, নিলাম লো! মাছ কোটে কে?

ব্রাহ্মণী। ওই আসছে মাছকুটুনি বঁটি হাতে ক'রে।

মাছকুটুনি মাছ কুটিতে বসিয়া গেল

সিকদার। কুটলাম লো কুটলাম! মাছ ধোয় কে?

মাছকুটুনি। ওই যে আসে ধোয়নি ঘটি হাতে ক'রে।

ধোয়নি মাছ ধুইতে লাগিল

সিকদার। ধুলাম লো ধুলাম! মাছ রাঁধে কে!

মাছধোয়নি। ওই আসে রাঁধুনি আগুন হাতে ক'রে।

রাঁধুনির রাঁধা আরম্ভ

সিকদার রান্নার ধোয়াতে চোখ মুছিয়া নাক সিঁটকাইয়া। খাইবে কে?

রাঁধুনি। ওই আসছে খাউনি থালা হাতে ক'রে।

সকলে খাইতে বসিয়া গেল

সিকদার সনিশ্বাসে। এঁটো নেবে কে?

খাউনিরা। ওই আসছে এঁটো-নেওনি গোবর হাতে ক'রে।

সিকদার চটিয়া সকলকে ধাক্কাধোক্কা দিয়া। যা নেওনি, মাছকুটুনি, আঁশ-ধোয়নি, মাছরাঁধুনি, ভাতখাওনি, পাতকুড়োনি, যা।

সিকদারনি। আমরা নিমো, ধুমো, রাঁধমো, কুটমো, খামো, কেলমো, যেমন-তেমন কৈর‍্যা।

ব্যস্ত হইয়া সূর্যের বাপের প্রবেশ

বাপ। পান দিবে কে?

সিকদার। ওই আসছে পান-খাওয়ানি ডিবা হাতে ক'রে।

বাপ। বিছানা পাতিবে কে?

সিকদার। ওই আসছে বিছানা-পাতুনি তোশক হাতে ক'রে।

সিকদারনি। শুইবে কে?

বাপ। ওই আসছে শুয়নি বালিশ হাতে ক'রে।

সিকদার। রাত পোহাইবে কে?

বাপ। ওই আসছে রাতপোহানি কাউয়া হাতে।

গান

কাউয়া বলে কা!
রাত পোয়াইয়া যা!

তৃতীয় দৃশ্য

হালামালার বাড়ি, ছাদনাতলায় একদল স্ত্রী ও পুরুষ বরবেশী লাউলকে আর হালামালাকে লইয়া। সকলকে ফুল ছিটাইতে ছিটাইতে:

এপারে লাউল, ওপারে লাউল, কিসের বাদ্য বাজে?
রাজার বেটা সওদাগর বিয়ে করতে সাজে।
সাজ সাজন্তি লাউল মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজকন্যা তুইলা দিব বিয়া।
সাজ সাজন্তি লাউল পায়ে নেপুর দিয়া।
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইলা দিব বিয়া।

ফুল ছিটাইয়া গান

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা,
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।

মালী-মালিনীর গান

ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়,
সে ফুল গেল দখিন গাঁয়।
মালিনী। দখিন গাঁইয়া মালি রে!
মালী। ফুলের ডালা লবি রে?
মালিনী। হাতে কলসি, কাঁখে পোলা,
কেমনে লব ফুলের ডালা রে।

এইখানে মাটির সঙ্গে রায় বা সূর্যের ছেলে রাওলের (লাউলের) বিবাহের ও মিলনের পালা শেষ হল। এর পরে ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফলে-ফুলে উর্বরা করে বিদায় হচ্ছেন। মেয়েদের লাউলকে ধরে রাখবার চেষ্টা।—

কই যাও রে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে বাজনা জানাও গিয়া।
ধোপা জানাও গিয়া, নাপিত জানাও গিয়া, পরুইত জানাও গিয়া।

কিন্তু ঋতুরাজের তো থাকবার জো নেই, তাঁকে একলা যেতেই হবে। আবার শীতের মধ্যে দিয়ে তিনি ফিরবেন, এই আশ্বাস দিলেন এবং মেয়েরা বিদায়ভোজের আয়োজন করে লাউলের ছোটো ভাই শিবাইকে পাত কেটে আনতে ব'লে চাল ধুতে বসল।—

চাউল ধুমু, চাউল ধুমু, চাউলের মালো পানি,
চাউল ধুইতে পড়ল চাউল,
পাটি বিছাইয়া ধলো চাউল যত বর্তিয়ে জানি।

তার পর আলোচাল দুধের জলে লাউলের স্নান

আলোচাল কাঁচা দুধে লাউল ছান করে,
শ্বশুরবাড়ি বউ থুইয়া লাউল ভাতে মারে।

এদিকে শিবাই কলাপাতা কাটছেন

মালী। লাউলের বাগানে কে রে কাটে পাত।

শিবাই। লাউলের ছোটো ভাই শিবাই কাটে পাত।
মালী। শিবাই যে, শিবাই রে, না কাটিও পাত।
শিবাই। বাইছা বাইছা কাটুমনে সব্‌রি কলার পাত।
মালী। সব্‌রি কলার পাতে নাকি লাউলে খায় ভাত ?
বাইছা বাইছা কাটো গিয়া চিনিচম্পা কলার পাত।

এদিকে লাউলের বউ ছেলেকে ঘুম পাড়াতে বসেছেন

লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে, কী কী নাম থুমু ?
আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু। বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।
কমলা দিয়া কমল নাম থুমু। জল দিয়া জয় নাম থুমু।
রাজার বেটা রাজার ছেইলা রাজা নাম থুমু।
লাউলের ঘরে ছেইলারে কী কী গয়না দিমু ?
হাতজোখা বলয়া দিমু, গলাজোখা হার দিমু,
বুকজোখা পাটা দিমু, কোমরজোখা টোড়া দিমু,
পাঁওজোখা গুজরি দিমু, দুই চরণে নেপুর দিমু,
লাউলের ছেইলা নাচবে, রাজার রাজ্য হাসবে।১॥

লাউলের ঘরে ছেইলা লো দুধ খাইবে কীসে ?
রাজার বেটা পাশা খেইলা বাটি জিনিয়া নিছে।
পাশা খেলিয়া জিনিলাম কড়ি,
কিনে আনলাম কপিলেশ্বরী।
কপিলেশ্বরী কিবা খায় ?
পুকুরপাড়ে দূর্বা খায়।
দূর্বা খাইয়া লো সই, শুকাইল দুধ ;
কি দিয়া পালব মোরা লাউলের ঘরে পুত ?
লাউলের ঘরে পুত না লো শক্ত বেড়ার মাটি,
বর্তি গো ভাই, যেন লোহার কাটি।২॥

লাউলের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে হালামালা একশত বহিন সঙ্গে জলে নাইতে চললেন।—

আয় লো শত বইন জলে রে যাই ;
জলে রে যাইয়া লো ঝাপ্পাটি খেলাই।

হাতের শাঁখা, টাকাকড়ি, পায়ের নূপুর এমনি সব নানা জিনিস ফেলে-ফেলে কুড়িয়ে খেলা।

খেলতে খেলতে না লো দুপ্‌পুরবেলা।

যখন জল থেকে উঠে এসে লাউলকে তারা ডাকছে তখন মধুমাস শেষ, ঋতুরাজের যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, তিনি চলেছেন। বৈশাখের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঝড়বাতাসে লাউলের আসন যেখানে মেয়েরা দেখছে সেখানে ফুলে-ভরা জইতের একটি ডাল ভেঙে পড়েছে—

জইতের মটকা ডাল ভাইঙ্গা পড়ল ঘরে,
লাউলের দুধভাত ছচি হইয়া পড়ে।

তখন মেয়েরা লাউলকে একটু অপেক্ষা ক'রে কিছু খেয়ে যেতে মিনতি করছে—

খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত ;
আমরা শত বইনে ফ্যালাম-নে পাত।

বৈশাখের মেঘ গর্জন করে উঠল, ঝড় হু হু বইল, উৎসবের সাজসরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড করে গরম বাতাসে ধুলো উড়ল, মলিন মুখে মেয়েরা ঋতুরাজকে বিদায় দিলেন।

আজ যাও লাউল, কাল আইসো।
নিত্য নিত্য দেখা দিও।
বছর বছর দেখা দিও।

পালা সাঙ্গ

এই মাঘমণ্ডল ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য যা, তাঁকে সেই রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিটায় কুয়াশা ভেঙে

দিলে সূর্য উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হল সূর্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হল কুয়াশা ভেঙে দেওয়া ও সূর্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশী গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্যকে রাজা-বর এবং সেইসঙ্গে সূর্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা ক'রে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুড়বাড়ি বাপের বাড়ির যে-সব ছবি আছে, সূর্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্তি দিয়ে দেখছে। তৃতীয় অংশে সূর্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক কথায় বসন্তদেব—টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্তি মানুষে গড়েছে এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে মাটির সঙ্গে ঘরের নিত্যকাজের এবং খুঁটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হল; তাকে জামাইয়ের আদরে খাওয়ানো-দাওয়ানো হল; তার ছেলেকে ঘুম পাড়ানো দুধ খাওয়ানো, মানুষ করে তোলার নানা কাজ। এই পুতুলখেলা আর-একটু অগ্রসর হলেই মা-যশোদার নীলমণিকে ক্ষীর সব ননী খাওয়ানো—'খাওয়াব সর, মাখাব ননী' এবং জগন্নাথকে খিচুড়িভোগ রাজভোগ দিয়ে, তাঁর রাজবেশ হস্তীবেশ এমনি নানা বেশ এবং রুক্মিণীহরণ চন্দনযাত্রা এমনি তাঁর নানা লীলা গড়ে নিয়ে মূর্তি-পূজার পুরো অনুষ্ঠানে দাঁড়ায়।

ভাদুলি ব্রতটি আমরা দেখলেম—বর্ষা দেশ জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় হচ্ছে আর শরৎ আসছে, এরই একটা উৎসব। মাঘমণ্ডল ব্রতে—শীতের কুয়াশা কেটে সূর্যের আলোতে ঝলমল বসন্তদিনগুলি আসছে, তারই উৎসব। দু-জায়গাতেই মানুষের মনের কামনা নাট্যক্রিয়ায় আপনাকে ব্যক্ত করলে। এমনি শস্পাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মানুষ শস্যের কামনা করছে; কিন্তু সেই কামনা সফল করবার জন্যে সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়হাতে 'দাও দাও' করছে তা নয়; সে যে-ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে

এই শস্‌পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্র মাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে, বাকি শস্য সরষে এবং ইঁদুরমাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান ক'রে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান। নিকোনো বেদির উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন-দেওয়া আলপনা; কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। এই বেদির চারি দিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শস্‌পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তার পর সাত-আট থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত-ধরাধরি করে বেদির চার দিক ঘিরে নাচগান শুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে।

ভাঁজো লো কল্‌কলানি, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা।
এক কলসি গঙ্গাজল, এক কলসি ঘি,
বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচব না তো কি ?

এর পর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে-মুখে ছড়া-কাটাকাটি করে :

পূর্ণিমার চাঁদ হেরে তেঁতুল হলেন বঙ্ক।
গড়ের গুগলি বলে, আমি হব শঙ্খ !
ওগো ভাঁজো, তুমি কিসের গরব কর ?
আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নারো !

সমস্ত রাত্রি দুই দলের নাচগান ছড়া-কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকমিক—এই ছবির একটি সুন্দর বর্ণনা পূর্ববঙ্গের তারাব্রতে একটি ছড়ায় আমরা পাই :

ষোলো ষোলো বর্তির হাতে ষোলো সরা দিয়া,
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

এর পরে রাত্রি শেষ; মেয়েরা আপন-আপন শস্পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিংবা নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্যবপন-ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হল এবং অনুষ্ঠান শেষ হল উৎসবের নৃত্যগীতে। কিন্তু দুঃখের দিনও বছরের মধ্যে আসে যখন পাতা ঝরে যায়, মাটি ভেতে ওঠে, জল ফুরিয়ে যায়। সেই-সব দিনে মনের বিষণ্ণতার ছবিও ব্রতে ফুটেছে দেখি। সেদিনের বসুধারা ব্রতের ছড়ায় কেবল 'জল আর জল'!

কালবৈশাখী আগুন ঝরে!
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু-শুকু, আকাশে ছাই!

উৎসাহ নেই, স্ফূর্তি নেই, কেবল দীর্ঘশ্বাসের মতো ছড়াটুকু হুতাশ জানাচ্ছে। অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই বা এখন কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো 'হরি হে রক্ষা করো' বলি মাত্র; কিন্তু ঋতুবিপর্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিল প্রাণসংশয়, সেই তখনকার মানুষরা কোনো অনির্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিন্ত হতে পারত না; সে 'বৃষ্টি দাও' বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলছে। এবং সে নিশ্চয় জানছে, বৃষ্টি কামনা করে দল বেঁধে তারা মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করে শিকের খোঁচায় ফুটো করে বট পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়ে যে বসুধারা ব্রতটি করছে, তাতে করে বৃষ্টির দাতা যে দেবতা তিনি তুষ্ট হচ্ছেন এবং এই প্রক্রিয়ার বলে মেঘও জল দিতে বাধ্য। এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রত করে না। কিন্তু তখনকার লোকে যে-বিশ্বাসে ব্রত করত তার মূলে যে-কামনা এখনো পূজায় বা প্রার্থনাতে সেই কামনা, কেবল অনুষ্ঠানটা ভিন্ন রকমের; ব্রতে কামনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের স্পষ্ট সম্পর্ক দেখি, যেমন—

বট আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে।
বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল, শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জলগঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে, অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে।

ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে; এক কথায়, ব্রত-গুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।

বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিংবা নাট্য আকারে, আলপনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মণ্ডন রূপে, থাকেই থাকে কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে। নাট্য নাচ গান এবং ছবি আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা ব'লে আমরা এখন বুঝি, তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হত। ব্রতের ছড়াগুলি যেখানে ছোটো-ছোটো যাত্রার পালার মতো গাঁথা হয়েছে, সেখানে নাট্য নৃত্য ও গীত -কলার যথেষ্ট অবসর রয়েছে দেখি।

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা,
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।

আবার যেমন : ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়, সে ফুল গেল দখিন গাঁয়।
দখিন-গাঁইয়া মালী রে! ফুলের ডালা লবি রে?
কাঁখে কলসি, হাতে পোলা, ক্যাম্‌নে লব ফুলের ডালা রে!

এই-সব ছড়াকে গান ছাড়া কী বলব? ছড়াগুলির বাঁধুনি আর সাজানোর ভঙ্গি এমন তালে তালে যে এগুলিতে সুর এবং নাচ দুয়েরই টান স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। এমনি মাঘমণ্ডল ব্রতে কুয়াশা ভেঙে সূর্য ওঠবার ছড়া এবং ভাদুলিব্রতের ছড়াগুলিতেও গীত নাট্য দুইই রয়েছে। দুই ব্রতেই পাত্রপাত্রী-স্থানকালভেদে ছড়াগুলি নাটকাকারে গাঁথা। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এক-সময়ে এগুলি মন্ত্রের মতো করে বলা হত না, অভিনীত হত।

ব্রতের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে, এখন যাকে বলি আমরা ধর্মানুষ্ঠান তা নয়;

এখন যাকে বলি আমরা কলাকৌশল তাও নয়। ধর্ম এবং শিল্প দুইই এখানে স্বাধীনভাবে আপনাদের দুটো দিক অবলম্বন করে চলছে না। ব্রতের মূলে কতখানি ধর্মপ্রেরণা, কতখানি বা শিল্পকলার সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত।

এখনও পাড়াগাঁয়ে রাখালেরা কুলাই ঠাকুরের ব্রত বলে একটা অনুষ্ঠান করে। সেটি থেকে ধর্ম আর শিল্প ক্রমে কেমন করে স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে উঠেছে, তার একটু আভাস পাব। পৌষসংক্রান্তির এক পক্ষ পূর্ব থেকে রাখালেরা একজনকে বাঘ সাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি-বাড়ি সন্ধ্যার সময় এই গানটি গেয়ে পূজারচাল ভিক্ষে করে বেড়ায়—

সকলে। ঠাকুর কুলাই ভোঁ
হ্যাটা চল রে ॥ ধ্রু ॥
হ্যাটা চল পাঁচিল-পার।
বাঘ। ঝপৎ গিরি রে ॥ ধ্রু ॥
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব ॥
সকলে। সুন্দের বনে রে ॥ ধ্রু ॥
বাঘ। সুন্দের বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হাম্বুর করে রব।
য়্যাক্ বাঘ রে ॥ ধ্রু ॥
সকলে। ঠাকুর কুলাই ভোঁ। ইত্যাদি

এই ছড়া তো শুধু আউড়ে যাবার নয়; এতে বাঘ হতে হবে, জোরে জোরে হাঁটা, ঝপাৎ করে পড়া, সজাগ হয়ে এদিক ওদিক দেখা এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস পর্যন্ত। এর সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের রাত্রি, অন্ধকার গাছপালা, মশাল জেলে রাখাল ছেলেরা এবং ছেলে মেয়ে বুড়ো নানা দর্শকের নানা ভাবভঙ্গি, খড়ের ঘর, প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ে দেখলে একপক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই আমরা পাব। বাঘের ভয় থেকে গোরুবাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা

করে রাখালেরা বাঘ সাজিয়ে এই বাঘের ছড়া প'ড়ে ব্রত করবে, এইটেই আশা করা যায়। কিন্তু এখানে দেখছি চাল প্রার্থনা করে রাখালেরা এই বাঘের গান গেয়ে গেয়ে রোজগার করছে। এখানে দেখছি অনুষ্ঠানের গীত-কলার অংশ ব্রতের বাকিটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে গান নাচ দুই যদৃচ্ছা করছে এবং ব্রতের দিন কেবল বাঘের মূর্তিকে পুজো দিয়েই কাজ সারছে; এইখানে ধর্মাচরণ আর শিল্পকলা দুটির ছাড়াছাড়ি হল। ব্রতের ধর্মাচরণের অংশ মূর্তিপূজার দিকে এগিয়ে গেল এবং শিল্প-অংশ ক্রমে বহুরূপীর বাঘের অনুকৃতি থেকে আরম্ভ হয়ে শিল্পের উচ্চতর একটি স্থানে পৌঁছতে চলল। পূজার দিকে পড়ল পূজ্য মূর্তি আর পূজক, আর শিল্পের দিকে এল দর্শক আর প্রদর্শক, এবং ব্রতকথা স্বাধীনভাবে কবিরা গাইতে লাগল— যেমন চণ্ডীর গান, শীতলার গান। এর থেকে রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি, কবি। এমনি পরে পরে ব্রতের সম্পর্ক থেকে দূরে যেতে যেতে নিছক যাত্রা নাটক থিয়েটারে এসে দাঁড়াল সেই-সব শিল্পকলা যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ব্রতীর কামনাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টায়। খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতের দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক; কিন্তু ব্রত থেকে যখন শিল্প বিচ্ছিন্ন তখন যে আলপনা দিচ্ছে, চিত্র করছে, অভিনয় করছে বা ছড়া বলছে কিংবা বাঘ সেজে কি আর-কিছু সেজে নৃত্য করছে সে যে ব্রতী হয়ে ধর্মকামনায় সেটা করছে—এ হতেও পারে, নাও হতে পারে, বাঁধাবাঁধি কিছু নেই। ব্রতের বাঘ বহুরূপীর বাঘে যেমন দাঁড়াল অমনি সেখান থেকে লাটসাহেবের ফটকের উপরের বাঘ পর্যন্ত হতে তার আর কোনো বাধা রইল না। মাঘমণ্ডলের সূর্যদেব যেদিন ফুলের টোপর মাথায় রায়ল বা লাউল মূর্তিতে ধরা পড়লেন, সেই দিন থেকে গ্রিক অ্যাপোলো থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল, পুরীর জগন্নাথ পর্যন্ত সব রাস্তা খোলসা হয়ে গেল। কল্পব্রত ও পুণ্যি-পুকুরের বেলের ডাল—পাথরে গড়া হয়ে বুদ্ধ-যুগের কল্পদ্রুম এবং আজকালের অস্‌লার কোম্পানির ইলেকট্রিক বাতির ঝাড় হয়ে দাঁড়াতে চলল, প্রতি পদক্ষেপে ব্রতের ধর্মানুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য

সমস্তই একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত রয়েছে এবং তারাই বড়ো হয়ে ক্রমে স্ব-স্ব-প্রধান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে—ধর্ম ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের মূলে এই কথা রয়েছে দেখি। এই স্বতন্ত্রতা শিল্প-সাহিত্য এবং ধর্মের প্রচারের পক্ষে দরকার হয় কি না এবং এই পার্থক্য থাকা ভালো কি মন্দ, সেটা বিচার করতে বসা কেবল তর্ক করা মাত্র। এইটে ঘটেছে। একসময়ে দেবমন্দিরের সঙ্গে নাটমন্দির এবং পূজাপার্বণের সঙ্গে দেবতার চরিত বর্ণন করে চন্দনযাত্রা রাসযাত্রা রুক্মিণীহরণ এমনি নানা অভিনয় ও চিত্রকার্য ইত্যাদি জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে সম্পর্ক সে গলাগলি ভাব ছেড়েছে; ধর্মমন্দিরে, নাটকের রঙ্গমঞ্চেও শিল্পপ্রদর্শনীতে সুনির্দিষ্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে। এখন আর থিয়েটারে কি গানের মজলিশে কিংবা চিত্রপ্রদর্শনীতে গিয়ে বলা চলে না যে, আমরা ব্রতী, ব্রত করতে বসেছি।

ব্রতের ছড়াগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার যে যোগ, ব্রতের আলপনাগুলির সঙ্গেও ঠিক সেই যোগটিই দেখা যায়। কতকগুলি ছড়া রয়েছে কেবল কামনা উচ্চারণ করাই যার কাজ:

বাঁশের কোঁড়া, শালের কোঁড়া,
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি;
আমি যেন হই রাজার ঝি।

কিংবা: আমরা পুজা করি পিটালির চিরুনি।
আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি। ইত্যাদি

আর-কতকগুলি ছড়া, যার উদ্দেশ্য শুধু কামনাটা উচ্চারণ নয়, কাজের জন্য যেটুকু তার চেয়ে অনেকটা বাজে সুর-সার চলা-বলা রয়েছে—যেমন দেখা গেল মাঘমণ্ডল ব্রতের সূর্যের বিয়ের ছড়াগুলিতে। আলপনাগুলি তেমনি দেখি দুই শ্রেণীর। একরকম আলপনা—সেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্তি—কতকটা ইজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো। এই-সব আলপনায় মানুষ নানা অলংকারের কামনা করে পিটুলির সব গহনা এঁকেছে। সেঁজুতি-ব্রতের আলপনায় ঘরবাড়ি, চন্দ্রসূর্য, সুপুরিগাছ, রান্নাঘর, গোয়ালঘর সবই

মানুষ এঁকেছে, কিন্তু এদের তো শিল্পকার্য বলে ধরা যায় না—এগুলি মন যা চায় তারই মোটামুটি মানচিত্র। কিন্তু এই যে নানারকমের পদ্ম মানুষ কল্পনা থেকে সৃষ্টি করেছে, কিংবা এই যে কলালতা, খুন্তিলতা, শঙ্খলতা, চালতালতা প্রভৃতি লতামণ্ডন, এই যে নানারকম আসনের পিঁড়িচিত্র—এগুলি মণ্ডনশিল্প, মানচিত্র নয়। যেখানে অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি সেখানে শুধু অন্নের বাটি-গুলি যেমন-তেমন করে এঁকে দিলেই কামনা সফল হতে পারত, কিন্তু তা নয়; মানুষ সেখানে দেখছি অনেক লতা-পাতা এঁকে পিঁড়িখানিকে সুন্দর করতে চেয়েছে—কাজের অতিরিক্ত অনেকখানি লেখা তাতে রয়েছে। তার পর এই তারাব্রতের সূর্য চন্দ্র তারা এরা কিছুর অনুকরণ নয়; শিল্পীর কল্পনা থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে। পিঁড়িগুলিতে কামনার প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চেয়ে কারিগরি করবার ইচ্ছাটাই প্রবল দেখা যাচ্ছে। আর বছরের শেষে পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে পৃথিবী ব্রতের এই যে আলপনাখানি—নরনারীর জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস নিয়ে পদ্মপাতার উপরে একবিন্দুর মতো এই যে টল্‌টল্ একটি সৃষ্টি—এটিকে তো কি পরিকল্পনার দিক দিয়ে কি কারিগরির দিক দিয়ে মানচিত্র কিছুতে বলা যায় না। পূর্ব-কালে মানুষ যে-কোনো কারণে হোক মনে করত, যে-জিনিস সে কামনা করছে তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিংবা তার প্রতিমূর্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ করবে। সে হিসেবে আলপনায় জিনিসটির প্রতিরূপ দিলেই তো কাজ চলে; কিন্তু দেখছি, মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; এবং তার মনও তৃপ্তি মানছে না যতক্ষণ-না শিল্পসৌন্দর্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে। অথচ কামনা-পরিতৃপ্তির পক্ষে আলপনা সুন্দর হল কি না হল তাতে বড়ো আসে যায় না।

কলমিলতা

এই যে লক্ষ্মীপূজার আলপনাতে মানুষ বিচিত্র রকমের পদ্মফুল এঁকেছে একটির সঙ্গে যার আর-একটির মিল নেই—এমন-কী, আসল পদ্মফুলের সঙ্গে নয়, এরই বা উদ্দেশ্য কী? মানুষের মনে কোথায় একটি গোপন উৎস রয়েছে, যেখান থেকে এই-সব আলপনা নতুন নতুন এক-একটি সৃষ্টির বিন্দুর মতো বেরিয়ে আসছে। ব্রতের আলপনাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে তার হাতের কাজগুলির বেশ একটি যোগ
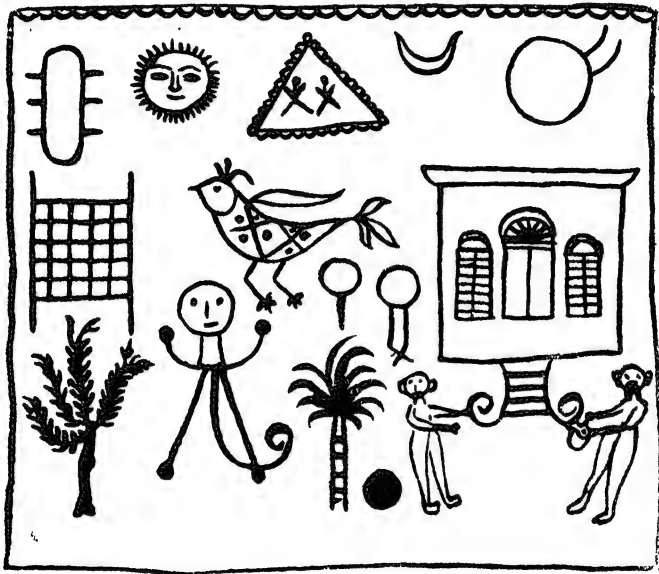
সেঁজুতি ব্রতের আলপনা

রয়েছে—কিন্তু অন্তরের কামনার সঙ্গে বাহিরের চেষ্টার যোগ থাকলেই যে সব সময়ে শিল্প-আকারে কাজটা দেখা দিচ্ছে তা তো নয়, বরং দেখি কামনা আর তার সিদ্ধির চেষ্টার মধ্যে যত কম অবসর এবং বাধা ততই মানুষের ক্রিয়া সুন্দর হয়ে দেখা দেবার সুবিধা পাচ্ছে না।

শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু

আবেগের বশে যাই করি তাই তো শিল্প হয় না। অনেকদিনের পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার গলা জড়িয়ে কত কথাই বলা হল, কিন্তু সেটা কাব্যকলা কি নৃত্যকলা দুয়ের একটাও হল না। কিন্তু বন্ধুর আসবার আশায় ভাবে ডগমগ হয়ে যেন মন নৃত্য করছে, তার জন্যে ফুলের মালা গাঁথছি, নিজে সাজছি, ঘর সাজাচ্ছি—নিজের আনন্দ নানা খুঁটিনাটি কাজে এটা-ওটা জিনিসে ছড়িয়ে যাচ্ছে—এই হল শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায় নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই, উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয়, অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা। এ সময় মানুষ সুন্দর-অসুন্দর বেছে নেবার সময়

চণ্ডীমণ্ডপের আলপনা

পায়, যেমন-তেমন করে একটা-কিছু করবার চেষ্টাই থাকে না। হঠাৎ যদি বাঘ এসে সামনে পড়ে তবে তার গায়ের চিত্রবিচিত্র ছাপ, তার গঠনের সৌন্দর্য, এ-সব কিছুই চোখে পড়ে না; ভয় এবং পালানো তখন এতই কাছাকাছি আসে যে সৌন্দর্য বোধ করবার অবসর মন পায় না বললেই হয়।
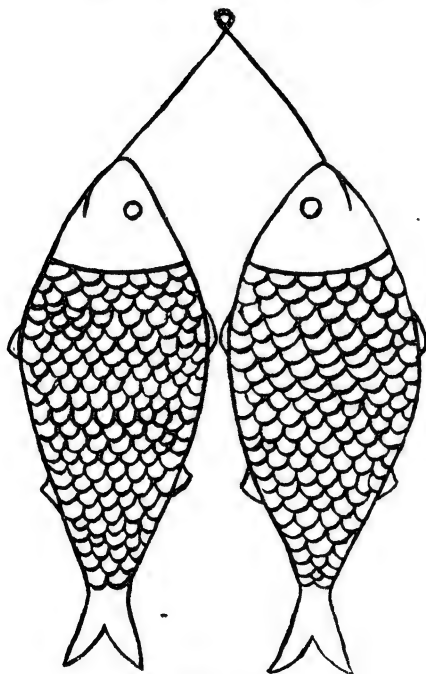
জোড়া মাছ

কিন্তু খাঁচার ওদিকে বাঘ এদিকে আমি, কিংবা দূরে বাঘ লাফিয়ে চলেছে, তখন আবেগ আর ক্রিয়ার মাঝে অনেকটা অবসর; সেখানে বাঘের নানা সৌন্দর্য চোখে পড়ে।

ব্রতের অনুষ্ঠান, শিল্পের উৎপত্তির অবসর কেমন করে এনে দিচ্ছে সেটা দেখা যাক। ব্রত-আচরণ আর শিল্পক্রিয়া—দুয়ের যে নৈকট্য দেখা

যায় তাতে করে দুয়েরই উৎপত্তি যে মানব-মনের একই প্রবৃত্তি থেকে, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকছে না। দুয়েরই মধ্যে দেখছি একটা জিনিস রয়েছে যা দুটোকেই চালাচ্ছে। সেটি হল কামনার আবেগ। যা কামনা হল তাই পেলেম তখনি, এ হলে ব্রত হল না। আবেগ থাকা চাই—যেটা নানা ক্রিয়ার মধ্যে গতি পেয়ে পরিসমাপ্তি পাচ্ছে। এ হল ব্রতের মূল কথা।

ব্রতগুলির মধ্যে এই আবেগটির অবসর কোন্‌খানে রয়েছে দেখব। এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ যখনকার যা তখনকার জন্যে ব্রত করছে না। ভবিষ্যতের একটা-কিছু পাবার জন্যেই ব্রতগুলির অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখি।—'গঙ্গা গুকুগুকু, আকাশে ছাই!' সেই সময় বর্ষার জলধারা কল্পনা করে বসুধারা ব্রতের অনুষ্ঠান। এই যে জ্যৈষ্ঠের সারা মাস আষাঢ়ের ছবি মনে জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে, এটা বড়ো কম অবসর নয় আবেগ ঘনীভূত হয়ে নানা শিল্পক্রিয়ায় প্রকাশ হবার জন্য। এমনি যখন খুব জল, আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস, তখন কুমারী ব্রত নেই। এর পরে ভাদ্র মাস পড়তেই শরতের দিনগুলির জন্যে ব্রত শুরু হল। শস্য হবে, যারা বাণিজ্যে গেছে তারা ফিরবে—এমনি-সব নানা কামনা ভাদুলি ব্রতটির মধ্যে নাট্যকাব্য হয়ে দেখা দিলে এবং আশ্বিনের শস্য-উৎসবে তার পরিসমাপ্তি হল। এমনি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি, কামনা অনেকদিন পর্যন্ত—কোথাও এক মাস, কোথাও বা দু মাস—অতৃপ্ত থাকছে চরিতার্থতার পূর্বে। শস্য ফলবার আগেই শস্য-উদ্গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদ্গমের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায় নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য এমনি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল। চিত্র করতে হলে বড়ো শিল্পী তো যেমন দেখলেন তেমনিটি আঁকলেন না। দেখলেন, দেখে সেটা মনে রাখলেন, এবং হয়তো দেখার থেকে অনেক পরে সেটাকে মন থেকে প্রকাশ করে দিলেন; দেখা ও প্রকাশ করার মাঝে যে-সময়টা সেই হল যথার্থ শিল্প-কাজের অনুকূল। দেখলেম, কল টিপলেম, ফোটো উঠল, এ হলে

জিনিসটা ঠিক অনুকরণ করা গেল বটে কিন্তু শিল্প বলতে অনুকরণের চেয়ে বড়ো যে-জিনিসটা তা হল না। ব্রতের আলপনাতেও তেমনি। সোনার চিরুনি চাই, পিটুলির চিরুনি এঁকে ব্রত করলুম। এখানে আলপনার অনুকৃতি পর্যন্ত রইল। কিন্তু আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী ধানের ক্ষেতের মধ্যে দেখা দেবেন কিংবা বসন্তে ফুল ফুটবে, সূর্য উঠবে—এই আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি যখন মনকে তোলাপাড়া ক'রে রয়ে-বসে প্রকাশ হতে চলল তখনই দেখি বিচিত্র আলপনায় পদ্ম, লতা,
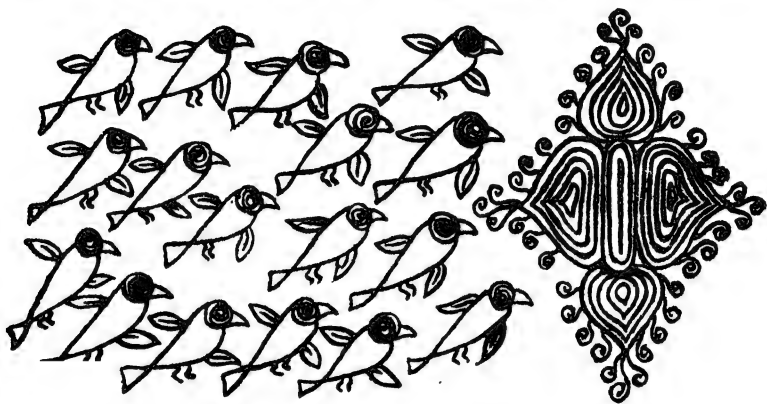
সুবচনীর হাঁস

পাতা, সূর্যোদয়ের নানা রূপক ও ছড়া এবং ফুলের ডালার গান, আমের মুকুলের গান, নানা রঙ্গরস।

আলপনা যে কত রকমের তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্ট্‌স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশি জিনিস মেয়েরা না-শিখেই লিখছে এবং সৃষ্টিও করছে। শ্রেণীবিভাগ করলে আলপনার ফর্দটা এই-রকম দাঁড়ায়। প্রথম, পদ্মগুলি। দ্বিতীয়, নানা লতামণ্ডন বা পাড়। তৃতীয়, গাছ, ফুলপাতা ইত্যাদি। চতুর্থ, নদনদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্য। পঞ্চম, পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ, চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র। সপ্তম, আভরণ ও নানাপ্রকার আসবাব। অষ্টম, পিঁড়িচিত্র।

আলপনার শিল্প হচ্ছে সমতল ভিত্তিকে চিত্রণ, এবং যা আঁকছি তার পরিষ্কার চেহারাটি দেওয়া। হাতা হাতার মতো না হয়ে হাতের মতো হলে চলে না ব্রতের কাজে। একটা জিনিসের ঠিক চেহারাটি দু-চার টানে আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ, তা চিত্রকরমাত্রেই জানেন। একজন এম. এ. ক্লাসের ছাত্রকে তার হাতের কলমটা আঁকতে বললে সে মাথায় হাত দিয়ে বসবে, কিন্তু তারই হয়তো পাঁচবছরের ভগিনীটি এই আলপনার সব কখানা অনায়াসে এঁকে যাবে নির্ভুল—হাতা বেড়ি গহনা ফুল পাতা সবই। মানুষ আর জানোয়ারদের বেলায় মেয়েরা একটু গোলে পড়েছে। কিন্তু এ ছাড়া যেখানে কল্পনা পাঠানো চলে এমন-সব বড়ো-বড়ো আলপনা এবং নানা লতা ও পাড়ের আবিষ্কারে তারা সিদ্ধহস্ত।

হাতে-পো কাঁখে-পো

সুবচনী-পুজোর আলপনাটিকে আমরা সুবচনী ব্রতকথার প্রতিরূপ-চিত্র বলে ধরতে পারি। রাজার পুকুরে অনেক হাঁস। তার সর্দার ছিল এক খোঁড়া হাঁস। এক ব্রাহ্মণকুমার সেই খোঁড়া হাঁস মেরে খেয়েছিল এবং সুবচনীর কৃপায় তার মা সেই হাঁসকে বাঁচিয়ে তবে রাজার কোপ থেকে নিস্তার পেয়েছিল। এই গল্পটাকে দেখাচ্ছে এই সুবচনীর আলপনা। সেঁজুতির আলপনা, ভাদুলি ব্রতের নদী ও তালগাছ—এ-দুটির মধ্যে নিছক কামনা জানানোর চেয়েও একটু বেশি কাজ মানুষে করেছে। কোঁচা দুলিয়ে সুপুরিবাগানে কর্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোড়া-বাংলার দরজায় দুই সেপাই পাহারা দিচ্ছে। (পৃ. ৭০) এই সুপুরিবাগানের কর্তার সঙ্গে হাতে-পো কাঁখে-পো (পৃ. ৭৫) মানুষের প্রতীকটির অনেক তফাত। যদিও খুব কাঁচা হাতের কিন্তু কর্তার ছবিতে বাস্তবিকতা অন্যটির চেয়ে ঢের বেশি

রয়েছে। এমনি নদীর আলপনা। এখানে গ্রামের মাঝ দিয়ে যে নদীটি বয়ে চলেছে, তার বাস্তবিক চেহারাটা দেবার চেষ্টাই নেই; সমস্ত দৃশ্যটি একটি সুন্দর মণ্ডন হিসেবে চিত্রকারিণী দিয়েছেন। এর পর, বাঁশের কোঁড়া, শালের কাজের মতো। তার পর নানা মন্দিরের আলপনাগুলি; এগুলিকে খাঁটি মণ্ডনচিত্র বলা যেতে পারে, যদিও এগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব

ঘরযাত্রার পদ্ম

যোগ। কিন্তু তাই বলে এগুলি যেমন-তেমন করে মানুষে আঁকে নি। মন্দিরের কারুকার্য, তার গঠনের তারতম্য, চিত্রকারিণী প্রত্যেক দিন নজর ক'রে দেখে দেখে তবে মন থেকে এগুলি প্রকাশ করেছেন, বেশ বোধ হয়।

পদ্মের আলপনাগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব কমই যোগ দেখা যায়।

দু-রকমের পদ্ম দেখা যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর পদ্মগুলিতে পদ্মের বাস্তব আকৃতি কতকটা দেওয়া হয়েছে এবং জ্যামিতির ঘরগুলিকে পদ্মের আকারে বাঁধা হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় পদ্মের সঙ্গে শঙ্খ জুড়ে সেটিকে লক্ষ্মীর আসন বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য যে-সব অষ্টদল পদ্ম এবং সেই-সব পদ্মকে ঘিরে যে-সব নানা লতামণ্ডন, সেগুলিকে মণ্ডন ছাড়া আর কী বলা যাবে? বারো-রকম লতায় ঘিরে আলপনা বিবাহের সময় বরের বাড়ির উঠোনে লেখা হয়। কন্যার বাড়িতেও এই-রকম

খুন্তিলতা

একটি বউছত্র দেবার নিয়ম। এগুলো ব্রতের নয়। বোম্বাই অঞ্চলে অতিথির সম্মানের জন্যে ভোজনের জায়গাটি রঙ্গোলি (আলপনা) দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া প্রথা। উৎসবের দিনে বিশেষ ব্যক্তির সম্মানের জন্যে যে সাজানো-গোছানো করতে হয়, এই আলপনাগুলিকে সেই কোঠায় ফেলাই ঠিক। বোম্বায়ে অতিথি-অভ্যর্থনার জন্যে যে আলপনা তারই কতকটা প্রতিরূপ হচ্ছে আমাদের নববধূ-আগমনের পানসুপারি-লেখা আলপনাটি। এই ধরনের আলপনাগুলির সঙ্গে মনের নানা ভাবের যোগ থাকলেও এগুলি ব্রতীর কামনা জানাচ্ছে না। লক্ষ্মীর আসনে শঙ্খ, ইন্দ্রের আসনে বজ্র, আবার অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে নানা ব্যঞ্জনের বাটি, আর বর-কনের পিঁড়িতে 'একবৃন্তে দুই ফুল', এগুলো প্রধানত জানাচ্ছে আসনের পার্থক্য: এটি দেবীর, এটি দেবতার, এটি নবকুমারের, এটি বরবধুর। এবং ব্যক্তিবিশেষের

রুচি-অনুসারে এই-সব আলপনায় অদলবদল হয়। যেমন বিয়ের পিঁড়িতে পদ্ম ও ভ্রমর ইত্যাদিও চলে! এবং এই অদলবদলে বিবাহাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কোনো ব্যাঘাত হয় না। এমন-কি, পিঁড়িতে খানিক পিটুলিগোলা মাখিয়েও কাজ চলে। কিন্তু ব্রতের আলপনা ব্রতীর কামনার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠল, তার পর সেটা আলপনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হল, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হল। আগে কামনা, তার পর আলপনা, তার পর ছড়া, শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস—এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেলে।

আলপনার শঙ্খলতামণ্ডনটির বিষয়ে একটু বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আলপনার সমস্ত লতামণ্ডন-গুলিতে একটা বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে, সেগুলি মেয়েরা নিজে থেকেই আবিষ্কার করেছে, এবং এক বাংলার আলপনা ছাড়া, কি মান্দ্রাজে, কি বোম্বায়ে, কোথাও এত সুন্দর এই ধরনের লতামণ্ডন দেখি নি। মান্দ্রাজের 'দড়ির ফাঁস' এবং বিন্দুই আলপনা-চিত্রের ভিত্তি। কিন্তু বাংলার মেয়েরা প্রকৃতির মধ্যে যে-সব লতাপাতা তাকেই ভিত্তি করে আলপনা কলালতা, কলমিলতা (পৃ. ৬৯), খুন্তিলতা (পৃ. ৭৭), চালতালতা, চাঁপালতা, শঙ্খলতা সৃষ্টি করেছে দেখি। শঙ্খের ঘোরপেঁচগুলি প্রাচীন গ্রিস ও ক্রিটদেশের একটি প্রধান মণ্ডন। কিন্তু এই বাংলাদেশের শঙ্খলতায় শঙ্খের স্বরূপটি যেমন

শঙ্খলতা

সুস্পষ্ট এমন আর কোনো দেশেই নয়। এই শঙ্খলতার ঘোরপেঁচ শঙ্খ থেকে কি জলের আবর্ত থেকে, সেটা ইউরোপের মণ্ডনগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় না এবং এ নিয়ে সেখানকার পণ্ডিতে-পণ্ডিতে অনেক তর্কবিতর্ক চলেছিল। কোনো পণ্ডিতে বলেন এই লতামণ্ডন প্রথম ইজিপ্তে, কেউ বলেন ক্রিটদেশে—আবার কেউ বলেন ইউরোপখণ্ডে গ্রিসদেশেই এর প্রথম উৎপত্তি। কিন্তু কোথাও বাংলার মতো শঙ্খলতার নিখুঁত চেহারাটি আমরা পাই নে। ক্রিট, ইজিপ্ত এবং গ্রিস—সব থেকে দূরে এই বাংলাদেশ' এবং ওইসব প্রাচীন সভ্যতা থেকে কতদূরে এখনও রয়েছে বাংলার এককোণ যশোর। সেখানকার মেয়েদের হাতের এই শঙ্খলতাটি! এই লতামণ্ডন যে খুবই প্রাচীন, আধুনিক কোনো-কিছু থেকে নকল নয়, তা নিশ্চয়ই বলা যায়। বাঙালির মেয়ের সব চেয়ে পুরনো এবং সব চেয়ে সুন্দর ও যত্নের অলংকার শাঁখা। শাঁখ লক্ষ্মীর চিহ্ন এবং কড়ি ছিল এককালে এদেশের পয়সা। কাজেই শাঁখ এবং তা থেকে শঙ্খলতা আবিষ্কার এদেশে যে কেন খুবই প্রাচীন কালে হবে না, বুঝি নে। তা ছাড়া বাঙালি জাতিও বড়ো কম দিনের নয়। ইজিপ্তের রানিরা এবং গ্রিসের সুন্দরীরা ঢাকার মসলিন পরতেন যখন তখন যে বাংলাদেশ ও বাঙালি বর্তমান ছিল, অন্তত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না; এবং পূর্বকালের কোনো ঢাকাই শাড়ির পাড়ে লুকিয়ে এই শঙ্খলতা গ্রিসে ও ইজিপ্তে চালান যায় নি, তাই বা কে বলতে পারে। একই চিন্তা, একই শিল্প, একই মণ্ডন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে—এটা মানুষের ইতিহাসের একটা সাধারণ ঘটনা; কাজেই এ-বিষয় নিয়ে তর্ক করা চলে না।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- বিশ্বপরিচয় ১৮·০০
- ইতিহাস ১৬·০০

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
- বাংলা সাহিত্যের কথা ২২·০০

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
- ব্যাধির পরাজয়
- পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৭·০০

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
- ভারতদর্শনসার ২৪·০০

নির্মলকুমার বসু
- হিন্দুসমাজের গড়ন ১৫·০০

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- প্রাণতত্ত্ব ১০·০০

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
- পূজাপার্বণ ১৮·০০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২০·০০

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- বাংলা উপন্যাস

সত্যেন্দ্রকুমার বসু
- হিউ-এন-চাঙ

যোগেশচন্দ্র বাগল
- বাংলার নব্যসংস্কৃতি

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
- আহার ও আহার্য

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত
- পৃথ্বীপরিচয় ৭·৫০